কল্পনার বিজ্ঞান

ট্যাকিয়ন

ডিসেম্বর, ২০২৩

এমন কেন হয়

কল্পনার বিজ্ঞান

ট্যাকিয়ন

ডিসেম্বর ২০২৩ সংখ্যা

পিডিএফ সংস্করণ

মূল্য – আপনাদের ভালোবাসা

ট্যাকিয়ন কার্যনির্বাহী টিমের সদস্যরা

কে. এম. শরীয়ত উল্লাহ - প্রেসিডেন্ট,

রওনক শাহরিয়ার - জেনারেল সেক্রেটারি,

এস. মাহমুদ নাবিল - আইটি সেক্রেটারি,

সাঈদ ইসলাম শুভ - সহকারি আইটি সেক্রেটারি,

সৈয়েদা তাসনিম - অর্গানাইজিং সেক্রেটারি,

এম সামিউল হাসনাত - সহকারি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি,

মো: সোহেদুজ্জামান বসুনিয়া শাকিব - পাবলিকেশন সেক্রেটারি

সানজিদা ইসলাম শেফা – সহকারি পাবলিকেশন সেক্রেটারি

মোহাম্মদ সিফাত - ট্রেজারি সেক্রেটারি,

কল্পনার বিজ্ঞান

ট্যাকিয়ন

ডিসেম্বর ২০২৩

ম্যাগাজিন-যোদ্ধারা

সম্পাদক

রওনক শাহরিয়ার

লেখা সংগ্রহ, নির্বাচন ও ফ্যাক্ট চেক

রওনক শাহরিয়ার

মোহাম্মদ সিফাত হাসান

মাহমুদুল কবীর

সানজিদা আক্তার শেফা

মো: সোহেদুজ্জামান বসুনিয়া শাকিব

প্রচ্ছদ, লে-আউট ও ডিজাইন

রওনক শাহরিয়ার

কে. এম. শরীয়ত উল্লাহ

মো: সোহেদুজ্জামান বসুনিয়া শাকিব

প্রুফ রিডিং

ওয়াসীমুল ইসলাম রাব্বি,

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

ইনফোগ্রাফ ও মিমস

সানজিদা ইসলাম শেফা

মেহেদি হাসান মিফতি

জাকিয়াতুল জান্নাত

প্রশ্নোত্তর পর্ব

সৈয়েদা তাসনিম

আমাদের কিছু কথা

এমন কেন হলো? প্রশ্নটা খুব সহজ মনে হলেও হাজার বছর পূর্বেও মানুষেরা একই প্রশ্ন করত। আমরা যখনই প্রশ্ন করেছি, তখনই নতুন করে জানার চেষ্টা করেছি। প্রশ্ন করা আমাদের অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচনে সহায়তা করে এবং অনুমানকে করে আরও ধারালো। সাথে শেখার অদম্য ইচ্ছে করে জাগ্রত। সভ্যতার উন্নতি, কিংবা নতুন সৃষ্টিশীলতার কারিগর হিসেবে কাজ করে এটা।

ট্যাকিয়নের এবারে ম্যাগাজিনে সাজানো হয়েছে প্রচলিত এমনই এক ঝাক প্রশ্নোত্তর দিয়ে। যেগুলো পাঠকের মনের জানার তৃপ্তি পূরণে সহায়তা করবে। বছরের শেষ এই সংখ্যাতে আরও সাজানো হয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ফিচার, ধাধা, প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং বিজ্ঞান ফ্যাক্টস সহ নানাবিধ তথ্য দিয়ে ।

ট্যাকিয়ন একটি বিজ্ঞান সংগঠন হিসেবে সবার কাছে বিজ্ঞানের ব্যাপারগুলো বৈজ্ঞানিকভাবেই তুলে ধরতে পছন্দ করে। তবে এখানে কল্পনাশক্তি ব্যবহারেও কোনো বাধা নেই। বিজ্ঞানে কল্পনাকে কেউ আটকাবে না, বাধা দেবে না ।

- রওনক শাহরিয়ার

জেনারেল সেক্রেটারি ও সম্পাদক, ট্যাকিয়ন

আমাদের সাথে যুক্ত হতে

ওয়েবসাইট: https://tachyonts.com

ফেইসবুক পেইজ: www.facebook.com/TachyonTs

ফেইসবুক গ্রুপ: www.facebook.com/groups/tachyonts

ইউটিউব চ্যানেল: https://youtube.com/c/tachyonts

ই-মেইল: editortachyon@gmail.com

সূচিপত্র

বছরের সেরা বিজ্ঞান ছবি

রাজউক কলেজে আয়োজিত হলো "১ম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও প্রবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতা ২০২৩"

আপডেট

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সুনামির পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা তৈরি
মোহাম্মদ কামরুল হাসান

ফিচার

এমন কেন হয়
কোনো একটি ঘটনা কেন ঘটে তার পিছনের রহস্য উৎঘাটনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বিজ্ঞান। সেই অবদানকে মাথায় রেখে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরসহ সাজানো হয়েছে এই অংশটি

বিষয়ভিত্তিক আর্টিকেল

নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়
জোনায়েদ আলী

Collatz Conjecture - গণিতের যে সমস্যা সমাধান হয়নি আজও
আযরাফ খান যারিফ

সিকেল সেল এনিমিয়া প্রকট বংশগত ব্যাধি
মো: আসিফ শাওয়াল

এল-নিনো এবং লা-নিনা
মুনেম শাহরিয়ার

ভেক্টর গুণের গুণাগুণ
মাহমুদুল কবীর

WEB 3
তারুণ্য

দ্য মিথ: আনারস এবং দুধের কথিত প্রাণঘাতী জুটির পিছনে সত্যের সন্ধান
মুনেম শাহরিয়ার

নোবেল পুরস্কার ২০২৩

রসায়নে নোবেল পুরস্কার
মাহমুদুল কবীর

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার
মোঃ সিফাত হাসান

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার
সানজিদা আক্তার শেফা

নিয়মিত বিভাগ

কুইজ

মিমস

গণিতের ধাঁধা

বিজ্ঞানীদের গল্প

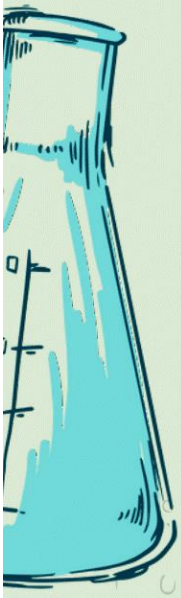

রাজউক কলেজে আয়োজিত হলো “১ম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও প্রবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতা - ২০২৩”

রাজউক কলেজ সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে মাসব্যাপী আয়োজনের মাধ্যমে শেষ হলো “১ম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও প্রবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতা - ২০২৩”। ১৪ই এপ্রিল ২০২৩ হতে অনলাইন ও অফলাইনে প্রতিযোগিতার জন্য লেখা প্রদানে আহ্বান করা হয়। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা জুনিয়র (৬-৮ শ্রেণি), সেকেন্ডারি (৯-১০ শ্রেণি) ও হায়ার সেকেন্ডারি (১১-১২ শ্রেণি), এই ৩টি ক্যাটাগরিতে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

১৪ই এপ্রিল থেকে ৬ই মে পর্যন্ত চলে লেখা সংগ্রহের কাজ। প্রতিযোগিতায় প্রায় ২ শতাধিক লেখা জমা দেয় শিক্ষার্থীরা। সেগুলো হতে প্রাথমিক যাচাই বাছাই শেষে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণের জন্য পাঠানো সম্মানিত বিচারক মন্ডলীদের কাছে। প্রতিযোগিতায় “বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর” চূড়ান্ত বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক কাউন্সিলর ‘সকাল রয়’ এবং “বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের” দায়িত্ব পালন করেন জনপ্রিয় বিজ্ঞান ভিত্তিক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ‘ইমতিয়াজ অর্ণব’ (Story head)।

গত ৩১শে মে,২০২৩ তারিখে রাজউক কলেজ সায়েন্স ক্লাবের অরিয়েন্টশন অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরষ্কার প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতায় ৩টি ক্যাটাগরি ও ২টি সেগমেন্ট মিলিয়ে মোট ১৮ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম বাহাউদ্দীন। পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন রাজউক কলেজ সায়েন্স ক্লাবের ওআইসি এস. কে. মোঃ আক্তার হোসাইন। এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারক ‘সকাল রয়’ ও বাংলাদেশের প্রথম এস্পাইরিং এস্ট্রোনট ‘শাহ জালাল জোনাক’।

বৈজ্ঞানিক গল্প সেগমেন্টে জুনিয়র ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে আরাফ হাসান, আহসান আনসারী ও মাশরাফি ইসলাম। সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে ফাইরুজ ফাইজা ধারা, শাহরিয়ার আবেদীন ও কাজী মুক্তাসিদুর রহমান। হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে জেবা আফরিন, তশরিফ আলম ও আরহাম মবারাত।

প্রবন্ধ সেগমেন্টে জুনিয়র ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে আরাফ হাসান, মাশরাফি ইসলাম ও কুহালী ওসমান। সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে রাফিফ আবরার, মো: মুহাইমেন ও প্রত্যুষা এবং হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে কাইসান রহমান, খন্দকার মাহা রেজা ও আনিলা রহমান অরোরা।

প্রতিযোগিতার মিডিয়া পার্টনার ছিল বিজ্ঞান চিন্তা এবং প্রমোশনাল পার্টনার হিসেবে ছিল ট্যাকিয়ন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে

সুনামির পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা তৈরি

কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীগণ এমন একটি প্রাথমিক সতর্ক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন, যা দ্রুত ভূমিকম্পকে সনাক্তকরণ এবং সুনামির ঝুঁকি নির্ধারণ করতে সক্ষম। আধুনিক তরঙ্গ-বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে এটা টেকটনিক প্লেটের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করতে পারে। সমুদ্রগর্ভস্থ হাইড্রোফোন ব্যবহার করে শব্দ ধারণ করা হয়, যা দিয়ে ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরে সংঘটিত ভূমিকম্পসমূহের শব্দ বিকিরণ পরিমাপ করা যায়।

গবেষকদের মতে, "সুনামি অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ঘটনার কারণ, যার ফলে বিপুল প্রাণহানি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি ঘটায়। এর ফলে অঞ্চলগুলোর সমগ্র অবকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ে।" তিনি আরও বলেন, গবেষণায় দেখা যায় কীভাবে শব্দ-মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সুনামির আকার এবং ব্যাপকতা সম্পর্কে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব। এটা সুনামির তুলনায় অনেক দ্রুত পানির মধ্য দিয়ে যায়, উপকুলীয় অঞ্চলে সুনামি আসার পূর্বেই সতর্কতা অবলম্বন সম্ভব হয়। শব্দ-মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গগুলি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া শব্দ তরঙ্গ, যা শব্দের গতিতে গভীর সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলে এবং হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিতে পারে।

তিনি আরও বলেছেন, "এই শব্দ বিকিরণটি ভুমিকম্পের মূল উৎস সম্পর্কেও তথ্য বহন করে। ফলে দূরবর্তী স্থান থেকেও উৎস রেকর্ড করা যেতে পারে, এমনকি উৎস থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরেও। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সব সমুদ্রগর্ভস্থ ভূমিকম্প সুনামি সৃষ্টি করে না।"

বর্তমান সতর্কতা ব্যবস্থায় সুনামি সনাক্ত হওয়ার আগেই সমুদ্রের পানি উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছে যায়। অর্থাৎ জলোচ্ছাসের ওপর নির্ভর করা হয়, যার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের সর্তকতার জন্য খুব কম সময় থাকে।

বিদ্যমান সতর্কতা ব্যবস্থার পাশাপাশি ব্যবহার উপযোগী করে ডিজাইন করা হয়েছে। তারা হাইড্রোফোন রেকর্ডিং ব্যবহার করে টেকটোনিক ইভেন্টের উৎস বের করার জন্য একটি কম্পিউটেশনাল মডেল ব্যবহার করেন।

তারপর অ্যালগরিদমগুলি ভূমিকম্পকে শ্রেণিবদ্ধ করে ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য যেমন দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ, উত্থান গতি এবং সময়কাল ও সুনামির আকার প্রকাশ করার কাজ করে।

গবেষকদের মতে, "প্রাথমিক পর্যায়ে স্লিপের ধরণ জানা থাকলে তা ভুল অ্যালার্ম কমাতে পারে এবং ক্রস চেকিং-এর মাধ্যমে সতর্কতা ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং উন্নত করতে পারে।"

সুনামির ঝুঁকি ভবিষ্যদ্বাণী করা দলের কাজটি সারা বিশ্বে প্রাকৃতিক বিপদ সতর্কতা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের অংশ। জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী সফটওয়্যার সর্বশেষ যুক্ত করা হবে এই বছরেই, যা জাতীয় সতর্কীকরণ সেন্টারগুলোতে সর্তকতা প্রদানে সহায়তা করবে।

লেখক - মোহাম্মদ কামরুল হাসান,
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

প্রশ্ন: আমের ভিতরে পোঁকা হয় কীভাবে?

উত্তর: গ্রাম বাংলার এক অতিপরিচিত ধাঁধাঁ হচ্ছে-

"মায়ের পেটে থাকিয়া সে মায়ের মাংস খায়,
মাটিতে পড়িয়া সে ছয় পায়ে দাঁড়ায়।"

উত্তরটি কি হবে জানেন? উত্তরটি হচ্ছে আমের পোঁকা। বাইরে থেকে দেখতে নিঁখুত, পরিপক্ক, লোভনীয় একটি আম। কিন্তু যখন আপনি তা কেটে খেতে যাবেন তখনি আবিষ্কার করলেন এর ভেতরে থাকা পোঁকাটিকে। আম খাওয়ার বাসনা তো মন থেকে উড়ে গেলই, সাথে সাথে মনের কোনে উঁকি দিলো একটি প্রশ্ন। বাইরে থেকে কোনো ধরনের ক্ষতি না করে কীভাবে আমের ভিতর পোঁকাটি গেল?

আমে মূলত দুই ধরনের পোঁকা পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে আমের ফ্রুট ফ্লাইয়ের লার্ভা এবং আরেকটি হচ্ছে আমের গুবরেপোঁকা সদৃশ পোঁকা।

মের ফ্রুট ফ্লাই-এর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Ceratitis cosyra। স্ত্রী ফ্রুট ফ্লাই আম আঁধাপাঁকা অবস্থায় আমের বোটা দিকের অংশে হুলের মাধ্যমে নিজের ডিম প্রবেশ করিয়ে দেয়। এই হুল ফোটানোর স্থান খুবই সরু হয় বিধায় আম পাকার সাথে সাথে সেই স্থান ভরাট হয়ে যায় ফলে বাইরে থেকে আর দেখা যায় না। এই ফ্রুট ফ্লাই-এর ডিম ২-৩ দিন পরে ফুটতে শুরু করে এবং আমের ভেতর দিয়ে খেতে খেতে সুরঙ্গ সৃষ্টি করে। একটি আমে একই সাথে ৫০টি পর্যন্ত লার্ভা থাকতে পারে। লার্ভা থেকে পিউপায় পরিনত হওয়ার পরে এই পিউপা আমের ত্বক ভেদ করে বেরিয়ে আসে এবং মাটির উপরস্থ স্তরে প্রবেশ করে। ৯-১২ দিন পরে সেই পিউপা পরিপূর্ন ফ্রুটফ্লাইয়ে পরিণত হয়ে উড়ে যায়। তবে আমাদের দেশে এই ধরণের পোঁকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম।

আমাদের দেশে আমের ভেতর যে পোঁকাটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সেটি হচ্ছে আমের গুবরেপোকা সদৃশ পোঁকা। এর বৈজ্ঞানিক নাম Sternochetus mangiferae। আম যখন খুব ছোট থাকে তখন স্ত্রী পোঁকা আমের গায়ে ছোটো ছিদ্র করে সেখানে একটি মাত্র ডিম পাড়ে। এরপর স্ত্রী পোঁকাটি নিজের দেহ হতে এক ধরনের তরল পদার্থ বের করে ডিমটি ঢেকে দেয়। এরপর স্ত্রী পোঁকাটি সেই ডিমের কাছেই আমের গায়ে খুব ছোটো দাগ কাটে। ফলে এই কাটা স্থান হতে যে রস বের হয় তা ডিমের আবরণটিকে আরো শক্ত করে এবং ডিমকে আরো বেশি সুরক্ষা প্রদান করে। এভাবে স্ত্রী পোকাটি আরো অনেক আমে এভাবেই ডিম পেড়ে থাকে। এক সপ্তাহের ভিতর ডিম হতে লার্ভা বের হয় যা আমের ভিতর দিয়ে সুরঙ্গ কেটে আমের বীজে প্রবেশ করে এবং সেখানেই অবস্থান করে এবং বীজের ভেতরের অংশ খেতে থাকে যতদিন না লার্ভা হতে তা পিউপা তে পরিনত হয়। এর মধ্যেই আমটি বড় হতে থাকে ফলে ধীরে ধীরে পোকাটি প্রবেশের রাস্তাও আমের দ্বারা বন্ধ হয়ে যায়। ৪-৮ সপ্তাহ পর পিউপাটি পুর্নবয়স্ক পোকায় পরিণত হয় এবং আম হতে বেরিয়ে আসে।

এই দুইধরনের পোকাই মূলত আমের ভেতর পাওয়া যায় যারা আপাতদৃষ্টিতে নিঁখুত আমের ভিতরেও থাকতে পারে এবং ভেতর হতে আমের ক্ষতিসাধন করে আর মানুষের মনেও প্রশ্ন জাগায় যে আমের ভিতর পোঁকা হয় কীভাবে।

লেখক: মেহেদি হাসান মিফতি

প্রশ্ন: মাছি বসে বসে ওর হাত পা ঘষে কেন?

উত্তর: মাছিদের সারা শরীরে থাকে অসংখ্য সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম লোম। আবার এদের জিহ্বাও আঠালো পদার্থের একটি আস্তরণ দিয়ে আবৃত থাকে । আর মাছিরা নিজেদের শরীরকে পরিষ্কার রাখার জন্য দুই পা ঘষে। এই প্রক্রিয়ায় মাছির লোমে আটকে থাকা ময়লার কণা আমাদের খাবারে পড়ে যায়। আর এই ময়লার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বিভিন্ন রোগের জীবাণু। যা খাবারের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে সেই দূষিত খাবার খেয়ে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনকি, এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। সাধারণ ভাবে যে-সব রোগ ছড়ানোর জন্য মাছি দায়ী হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল টাইফয়েড, জ্বর, যক্ষ্মা, কলেরা ইত্যাদি।

লেখক: ফ্লোচিনাও

প্রশ্ন: অ্যাভোগ্রেডোর সংখ্যার বিশালতা বুঝাতে এমন কোনো উদহারন দিতে পারবেন?

উত্তর: মনোযোগ দিয়ে দেখি:-

১ লাখ সেকেন্ড কে দিনে প্রকাশ করলে ১ দিনের একটু বেশি হয়, আবার ১ কোটি সেকেন্ড কে দিনে প্রকাশ করলে ১১৭ দিন হয় প্রায়। আরেকটু উপরে গেলে ১ শত কোটি বা আন্তর্জাতিক গননায় ১ বিলিয়ন সেকেন্ড কে দিনে তথা বছরে প্রকাশ করলে হয় প্রায় ৩২ বছর | এ পর্যন্ত ঠিক আছে? তাহলে,

এভোগেড্রোর সংখ্যা (6.023*10^23) সেকেন্ড কে বছরে প্রকাশ করলে হয় প্রায় ১ কোটি ৯১ লাখ বিলিয়ন বছর, এতো বড় সংখ্যা কে প্রকাশ করতেই ঝামেলা হচ্ছে|

উত্তর: আখতারুজ্জামান সন

প্রশ্ন: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার এর মাঝে পার্থক্য কী?

উত্তর: অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার হল যেটা, যেগুলা হার্ডওয়্যার এর সাথে কাজ করে একটা কাজ করার enviroment তৈরি করছে। যেমন, উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার। যা সরাসরি হার্ডওয়্যার সাথে কাজ করে ।

এটা হার্ডওয়্যার আর অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এর মধ্যকার ইন্টারফেস।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হল যেটা অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার এর ভিতরে রান করে। এটা specific কোন কাজ করে। যেমন, notepad একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার । যার কাজ টেক্সট টাইপ লেখালেখি করা। VLC player অডিও ভিডিও প্লে করা।

এক কথায় বললে, অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটারকে ব্যাবহার উপযোগী করে তুলে। একটা ইন্টারফেস দেয় , যা হার্ডওয়্যার এর সাথে কাজ করে । অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার, সেই ইন্টারফেসে এর ভিতরে রান করে।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার এর উপর নির্ভরশীল। এক অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার এর জন্য বানানো অ্যাপ্লিকেশন

সফটওয়্যার অন্য অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যারে চলবে না ।

লেখক: শাহরিয়ার নাসিম নাফি

প্রশ্ন: আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কেন "দৈর্ঘ্য × প্রস্থ"?

উত্তর: এটাকে Axiom বলা হয়।
একে এভাবে দৃশ্যায়ন করতে পারেন।

এখন যদি বলা হয় ওপরের এক বক্স সমান এক একক।
তাহলে সব বক্স মিলিয়ে কতটুকু জায়গা লেগেছে?
সহজেই বলতে পারেন (৩×৫) অথবা (৫×৩) একক।

এখন এই ব্যাপারটাকে ক্ষেত্রফলের সাথে তুলনা করে দেখুন। বক্সের সাইজ ছোট হলে,
একেকটা বক্স একেকটা পয়েন্টের মতো বিবেচনা করা হবে। যখন বক্সের দখলকৃত জায়গার কথা জিজ্ঞেস করা হবে, সহজে সারির বক্সের সংখ্যার সাথে কলামের বক্সের সংখ্যা গুন করলেই হবে। কেন করা হলো এমন, সেটা ধারণা করতে পেরেছি হয়তো।
ক্ষেত্রফল বের করার ক্ষেত্রেও
তাই দৈর্ঘ্য ×প্রস্থ =এরিয়া।

লেখক: ইউসুফ আকন্দ সুজন

প্রশ্ন: অনেকেই বলে 7 আপ, স্পিড ইত্যাদি খেলে পেট ফাঁপা কমে বা খাবার হজম হয়। কতটুকু সত্য?

উত্তর: এগুলোর মধ্যে ফসফরিক এসিড সহ প্রচুর চিনি থাকে। আর একই সাথে উচ্চ চাপে কার্বন ডাইঅক্সাইড মেশানো হয়। খাওয়া পরে পাকস্থলীতে ফসফরিক এসিড মেশায় এখানে অম্লত্ব বাড়ে এবং একই সাথে যদি অম্লীয় কিছু খাওয়া হয় তবে অম্লত্ব অনেক বেশি বেড়ে যায়। যেটা মিউকাস মেমব্রেন নষ্ট করতে যথেষ্ট। তাছাড়া কার্বন ডাইঅক্সাইড অন্ত্রে গ্যাস জমা করে। যার জন্য পেট ফাঁপতে পারে।

ফসফরাস দেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর দেহে অজৈব ফসফেট দ্রুত শোষিত হয় । যেহেতু সফট ড্রিংকসে এটা বেশি মাত্রায় থাকে সেহেতু এর জন্য ফসফরাসের বিষাক্ততা সৃষ্টি হতে পারে । যারা বেশি বেশি সফট ড্রিংকস খায় তাদের হাড়ে ক্যালসিয়াম সঞ্চয় হ্রাস পায় । যা হাড়কে দুর্বল করে দেয় ।আবার কিডনীতে পাথর হবার ক্ষেত্রে এর সরাসরি সম্পর্ক আছে । বেশি ফসফরিক এসিড সমৃদ্ধ সফট ড্রিংকস খেলে সেগুলোর মেটাবলিসমের জন্য অক্সালেট আয়নের মাত্রা বাড়ে এবং এই অক্সালেট আয়ন গুলো কিডনীতে ক্যালসিয়াম আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে কিডনীর পাথর তৈরি করে ।

বেশি চিনি থাকায় কিছুদিন সফট ড্রিংকস খেলেই ওজন বেড়ে যায়, তাছাড়া কিছু কিছু সফট ড্রিংকসের মধ্যে চিনির বদলে সরবিটল বা সুক্রালোজ দেয়া থাকে । এগুলোতে ক্যালোরি শূন্য থাকলেও সরবিটল বা সুক্রালোজ অন্ত্রে জল শোষন কমিয়ে দেয়। যার জন্য পেট ফাঁপে। চিনির বিকল্প রূপে ভেষজ স্টিভিয়া খাওয়া ভালো। বর্তমানে স্টিভিয়া গাছ থেকে এটা তৈরি করা হচ্ছে। এক গ্রাম স্টিভিয়া এক গ্রাম চিনির চেয়ে 600 গুণ মিষ্টি হলেও তা প্রায় ক্যালোরি শূন্য । এর এক চা চামচে মাত্র 45 ক্যালোরি থাকে ।

লেখক: রিফাত হাসান

প্রশ্ন: আমলকি খেতে টক কেন?

উত্তর: কিছু কিছু আমলকীতে পিগমেন্ট কণা বিটা ক্যারোটিন বেশি থাকে তাই সেগুলো দ্রবণ কমলা -লাল হয়। উত্তেজিত ক্যারোটিন যৌগের আণবিক অরবিটালে ইলেকট্রন স্থানান্তরনের জন্য এমন হয়।

এর মধ্যে গ্যালেট এবং ট্যানেট লবণ আছে। যেটা খাবার পর মুখের টেস্ট বাডের সাথে যুক্ত হয় তখন স্বাদ ক্রিয়া বন্ধ থাকে তাই তিতা লাগে। কিন্তু একই সাথে মিষ্টি স্বাদ অনুভব করার টেস্ট বাড গুলো উন্মুক্ত থাকে ।

পানি খেলে সেই লবণ গুলো চলে যায় তাই তেঁতো লাগে না এবং একই সাথে Vitamin C এর জ্যামিতিক কাঠামো পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড যৌগের সাথে মিমিক করে তাই সেটা মিষ্টি স্বাদ গ্রন্থির কাছে থাকায় মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায় ।

লেখক: অজানা

প্রশ্ন: হাই উঠলে আশেপাশের মানুষদের কেন হাই তোলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়?

উত্তর: হাই তোলা দেহের একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যা স্বয়ংক্রিয় এবং অনৈচ্ছিক। হাই তোলা এক বিশেষ ধরনের শ্বাসক্রিয়া হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। তবে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, কেউ হাই তুললে কেন আশেপাশের মানুষদের মাঝে কেন হাই তোলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়?

হাই তোলা একটি সংক্রামক প্রক্রিয়া এবং মনে করা হয় সহানুভূতি এই প্রক্রিয়া অনুকরণের মূল কারণ। আমাদের আশেপাশে অন্য কোনো মানুষের হাই তোলার সূত্র ধরে আমাদের মধ্যেও হাই তোলার ইচ্ছা জাগে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাও হাই তুলি।এটি ইকোফেনোমেনা হিসেবে পরিচিত যা মানুষ,কুকুর এবং শিম্পাঞ্জির মধ্যে লক্ষণীয়।হাই তোলা ছাড়াও আমরা প্রতিনিয়ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যের কথা ও কাজের অনুসরণ করি।

অন্যকে হাই তুলতে দেখে নিজে হাই তোলার প্রবণতা 'সোশ্যাল মিররিং' বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত যেক্ষেত্রে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যের কাজকর্ম অনুসরণ করে।তবে এই বিষয়টি শুধুমাত্র পরিপূর্ণভাবে বিকশিত মস্তিষ্কে লক্ষ করা যায়।মানসিকভাবে সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ফলে অন্য কাউকে হাই তুলতে দেখলে তারাও হাই তোলার প্রবণতা দেখায় বা হাই তোলে।তবে সঠিক মানসিক বিকাশের অভাবে অনেক মানুষের মধ্যে অন্যের হাই তোলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাই তোলার প্রবণতা দেখা যায় না।এছাড়াও শিশুদের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ সম্পূর্ণ না হওয়ায় তারা অন্যের হাই তোলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয় বরং শুধুমাত্র ক্লান্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে হাই তোলে।আবার পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যারা অটিজম, স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত তাদের মধ্যেও এই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

গবেষণায় দেখা গেছে, অন্যের হাই তোলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাই তোলার প্রবণতা দেখানো সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ

হওয়ায় যেসব মানুষ আমাদের কাছের তাদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার প্রতিফলন বেশি ঘটে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পরিবারের কোনও একজন সদস্যকে হাই তুলতে দেখলে অন্যান্য সদস্যরাও সচরাচর হাই তুলে যেটি একজন অপরিচিত মানুষের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম ঘটে। তবে যেসব মানুষ যত বেশি সহমর্মী তাদের মধ্যে অন্যের হাই তোলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাই তোলার প্রবণতা দেখানোর পরিমাণ তত বেশি।

শরীরে অক্সিজেনের অভাব হলে হাই তোলে, এই কথা সঠিক নাহ।

লেখক: আমেনা খাতুন

প্রশ্ন: মহাশূন্য ঠান্ডা না কি গরম?

উত্তর: কোনো একটি বস্তুর সাথে তাপ আদান-প্রদানের মাধ্যমেই বস্তুটি শীতল বা উষ্ণ বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু মহাশূন্যে তো কোনো বস্তু নেই। তবুও কোনো তপ্ত বস্তু যদি মহাশূন্যে যায় তাহলে সে তাপমাত্রা হারাতে থাকবে। তাপ বিকিরণ করে এর তাপমাত্রা হবে মাইনাস 270.556 ডিগ্রি সেলসিয়াস। একে বলা হয় মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা। এই তাপমাত্রা প্রচন্ড শীতল। আর তার এই হারানো তাপ আশপাশে কোনো বস্তু থাকলে তাকে উত্তপ্ত করবে। কিন্তু সেও তাপ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত উক্ত তাপমাত্রায় চলে যাবে। অবশ্য সূর্যের দিকে বস্তুর যে দিকটা মুখ করে থাকবে সে উত্তপ্ত হবে। কিন্তু যে দিকটা সূর্যের আলো পাবে না, সেটা দ্রুত তাপ হারিয়ে অত্যধিক শীতল ঐ তাপমাত্রায় পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে মহাশূন্য ঠান্ডা, খুবই ঠান্ডা। কম্বল নিয়ে গেলেও শীত মানবে না!

উত্তর: মুনতাহা ফায়েজ

প্রশ্নঃ কচু পাতা ভিজে না কেন?

উত্তরঃ কচু পাতার সহজে না ভেজার কারণ মূলত এর হাইড্রোফোবিক (পানি বিকর্ষী) বৈশিষ্ট্য। কচু পাতার কিউটিকল আবরণ অতিমাত্রায় পিচ্ছিল হওয়াতেই পাতায় আটকে থাকতে না পেরে গড়িয়ে পড়ে যায়।

মূলত পাতার উপরের স্তরে এক প্রকার মোম জাতীয় পদার্থ রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা জানি যে সাধারণত পানির ঘনত্ব মোমের ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি। ফলস্বরূপ, এরা পরস্পর দ্রবীভূত হতে পারে না এবং মিশ্রণে পানি নিচে পড়ে থাকে আর মোম উপরে ভাসতে থাকে। এ-রূপ ধর্মই মূলত কচু পাতার উপরের স্তরে লক্ষ করা যায়। যার ফলে বৃষ্টির পানি পাতার ঐ মোমের স্তরের সংস্পর্শে আসলে বিকর্ষিত হয়ে নিচে পড়ে যায়।

অনেক সময় বৃষ্টির পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা পাতার উপরে জমতে থাকতেও দেখা যায়। এর কারণ হলো পানির অণুগুলো পরস্পরকে অতি ক্ষুদ্র আয়তন বরাবর হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ করে রাখে। চারদিক থেকে সমান চাপ প্রযুক্ত হওয়ায় পানির ফোটা গোলাকৃতির হয়, তবে অভিকর্ষের প্রভাবে সুষম না হয়ে অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টাকৃতি ধারণ করে।

লেখকঃ সানজিদা আক্তার শেফা

প্রশ্ন: অ্যালার্জি বেড়ে গেলে সর্দি কাশি বেড়ে যায় কেন?

উত্তর: আমাদের অনেকেরই বিভিন্ন বস্তুর প্রতি অ্যালার্জি রয়েছে। কারো খাবারের প্রতি, কারো ধুলাবালির প্রতি,

কারোও আবার পশুপাখির লোমে। যে জিনিসের প্রতি অ্যালার্জি তাকে বলা হয় অ্যালার্জেন।

নির্দিষ্ট অ্যালার্জেন যখন কারো শরীরে প্রবেশ করে তখন দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ইম্যুউন সিস্টেম) এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখায়। এর অংশ হিসেবে দেহের বিভিন্ন গ্রন্থির ক্ষরণ বেড়ে যাওয়া, অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচনের মতো নানা পরিবর্তন ঘটে। যখন শ্বসনতন্ত্রের গ্রন্থিগুলোর ক্ষরণ এবং ব্রঙ্কিয়াল পেশির সংকোচন বেড়ে যায় তখন শুরু হয় হাঁচি, কাশি কিংবা সর্দির মতো উপসর্গ।
তাই, কেউ যখন নির্দিষ্ট অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে আসে তখন হাঁচি,কাশি, সর্দি ইত্যাদি বেড়ে যায়।

লেখক: রিফাত হাসান

প্রশ্ন: ভ্যান্টাব্লাক কেন এত কালো?

উত্তর: আলোর প্রতিফলন আর রঙের ব্যাপারটা সবাই জানি। কোন বস্তুরে আলো পড়লে সেই বস্তু যদিবসব রঙ শোষণ করে ফেলে এবং কোন আলো প্রতিফলন না করে, সেই বস্তুকে আমরা কালো দেখি। এখন, পুরো পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যে ১০০% আলো শোষণ করতে পারে। সবাই-ই একটু না একটু আলো প্রতিফলন করেই করে। কিন্তু একটা কেউ তো এমন আছেই আছে যে সবার থেকে কম আলো প্রতিফলন করে। আর সেই বস্তুটিই হলো মনুষ্যসৃষ্ট "VantaBlack"।

" VantaBlack" নাম এর মধ্যে "Vanta" শব্দটি একটি এক্রোনিম যার পূর্ণরূপ Vertically Alined Nanotube Arrays. এই মহাশয়কে Activated carbon high density skeleton, Multiwalled carbon nanotube (MWCNT), Vantablack S-VIS এবং Vantablack S-IR নামেও ডাকা হয়। তিনি আলোর জন্য এতই ক্ষুধার্ত থাকেন, যে দৃশমান আলোর ৯৯.৯৬৫% -ই তিনি খেয়ে ফেলেন তথা শোষণ করেন। এটা এতোই কালো, যে এটাকে কোন 3D বস্তুর উপর প্রয়োগ করলে, বস্তুটি 2D এরকম একটা ভ্রম হয়। কোন দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া এ্যলুমিনিয়াম ফয়েলের উপর ভ্যান্টাব্ল্যাক ব্যবহার করলে দাগ দেখাই যায় না।

Surrey NanoSystems এর প্রতিষ্ঠাতা বেন জনসন ভ্যান্টাব্ল্যাক এর আবিষ্কারক। ব্রিটেনের ন্যাশনাল ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে এর প্রথম দিকের ডেভেলপমেন্ট করা হয়। ২০১৪ সালের জুলাইয়ে ভ্যান্টাব্ল্যাককে জনসাধারণে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রথম অর্ডার কমপ্লিট করা হয়। এ্যারোস্পেস আর ডিফেন্স সেক্টরে এর ডিমান্ডের সাথে তাল মেলানোর জন্য এর প্রোডাকশন কিছুটা বাড়ানো হয়। ২০২২ নাগাদ, এর উৎপাদন খরচ খুব বেশি হওয়ায় একক ভাবে কোন ব্যাক্তির কাছে এর সাপ্লাই এরা বন্ধ করে দেয় এবং শুধুমাত্র তাদেরকেই সাপ্লাই দেই, যাদের রিকোয়েস্ট তাদের মতে "Valid"।

২০১৯ সালে ফ্র্যাঙ্কফুর্টে মোটর শো'তে BMW X6 কার'সহ অনেক জায়গায় এই ভ্যান্টা ব্ল্যাকের ব্যবহার দেখা যায়। মূলত বিএমডব্লিউ'তে এর ব্যবহারই একে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা এনে দেয়। সেই বছরই একজন ফরাসি মিউজিসিয়ান Gesaffelstein তার এক মিউজিক শো'তে স্টেজ সাজাতে ভ্যান্টাব্ল্যাক ব্যবহার করেন।(বড়লোক্স বাজি)। এছাড়া এর আগের অর্থাৎ ১৮ এর শীতকালীন অলিম্পিকের একটা ট্র্যাকেও এর ব্যবহার করা যায়।

লেখক: তারুণ্য

প্রশ্ন: সূর্যের পাশে মাঝে মাঝে বলয় দেখা যায়। এর কারণ কী?

উত্তর: প্রকৃতিতে ঘটা অধিকাংশ আলোকীয় ঘটনা ঘটার কারণ হলো বরফ স্ফটিক (ice crystal) । বরফ স্ফটিক একই সাথে প্রতিফলক এবং প্রতিসরক হিসেবে কাজ করতে পারে। বরফ স্ফটিক এ আলোর প্রতিফলনের জন্য যেমন আলোকীয় ঘটনা রয়েছে, তেমনই রয়েছে প্রতিসরনের কারনে। বরফ স্ফটিক অনেক উচু স্তরের মেঘ থেকে সৃষ্টি হতে পারে। আবার সৃষ্টি হতে পারে মাঝারি কিংবা নিম্ন স্তরের মেঘ থেকে। যেমন ভাবেই তৈরি হোক না কেন সেটা এখন আলোচ্য বিষয় না। বরফ স্ফটিক বিভিন্ন আকারের হতে পারে। আলোকীয় বিভিন্ন ঘটনাবলির জন্য দায়ী যেসব আকার তার মধ্যে ষড়ভুজাকৃতির বরফ স্ফটিক অন্যতম।

ষড়ভুজাকৃতির বরফ স্ফটিক প্রিজম আকারের হয়। প্রিজম আকারের বরফ স্ফটিকের মধ্যে রয়েছে আবার কলাম আকৃতির স্ফটিক এবং প্লেট আকৃতির স্ফটিক। এইসব প্লেট এবং কলাম আকৃতির স্ফটিকগুলো যদি ৩০ মাইক্রোমিটার এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে স্ফটিকগুলো ধীরে ধীরে নিচের দিকে আসতে থাকে। নিচের দিকে আসার সময় কলাম স্ফটিকগুলো ভূমির সাথে প্রায় সমান্তরালভাবে এবং প্লেট আকৃতির স্ফটিকগুলো ভূমির সাথে উলম্বভাবে অবস্থান করে। এই বিন্যাসের ফলে আলোকীয় ঘটনাবলি সহজেই ঘটতে পারে। নিচের দিকে আসার সময় এসব স্ফটিক অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে, কোন কোনটি আবার লাটিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে পড়তে থাকে।

সূর্য, চাদের চারপাশে বৃহত বৃত্তাকার যে রংধনুর মতো বলয় দেখা যায় তাকে সাধারণভাবে হালো বলা হয়। হালো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন : ৯° হালো, ১৮° হালো, ২২° হালো, ৪৪° হালো, ৪৬° হালো ইত্যাদি। এর মধ্যে আমরা বেশিরভাগ সময় ২২° হালো দেখতে পাই। ৪৪° হালোও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু বাকি হালো ধরণগুলো সচারাচর দেখা যায়না। ২২° এবং ৪৪° হালো এর মূল কারণ হলো ষড়ভুজাকার কলাম আকারের বরফ ক্রিস্টাল।

২২° হালো : কলাম আকৃতির বরফ স্ফটিকগুলো ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে বিভিন্ন দিকে বিভিন্নভাবে ঘুরতে পারে। এর ফলে আলোকরশ্মি আপতিত হওয়ার একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র (wide range) তৈরি হয়। আলোকরশ্মির কিছু অংশ সরাসরি পর্যবেক্ষকের চোখে প্রবেশ করে এবং কিছু অংশ কলাম আকৃতির স্ফটিকের প্রিজম মুখে আপতিত হয়ে। আবার প্রতিসরনের মাধ্যমে এই প্রিজম হতে

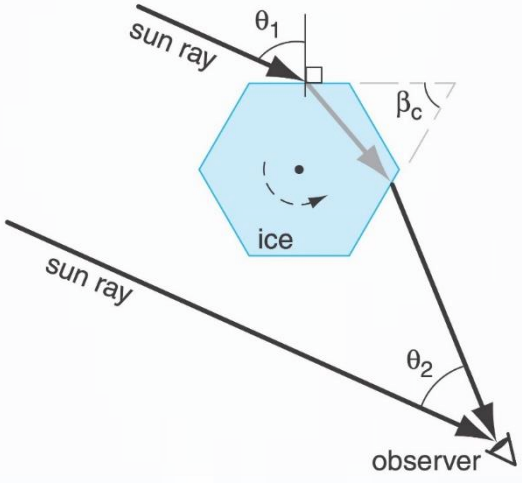

দিয়েই বেরিয়ে আসে। ফলে আপতিত দিকের সাথে আলোর একটি বিচ্যুতি কোণ তৈরি হয়। এই কোণের মান প্রায় ২২°। ২২° হওয়ার ফলে মনে হয় যেন আকাশে সূর্য হতে ২২° কৌণিক দূরত্বে একটি বৃত্তাকার রিং বা বলয় দেখা গেছে। এটাই ২২° হালো. এই ধরনের ক্ষেত্রে কোণের মান পুরোপুরি ২২° হয়না। কিন্তু প্রায় ২২ ধরা যায়!! ২২° হালো এর জন্য কেন্দ্রের দিকের আলোর রং লাল দেখা যায়।

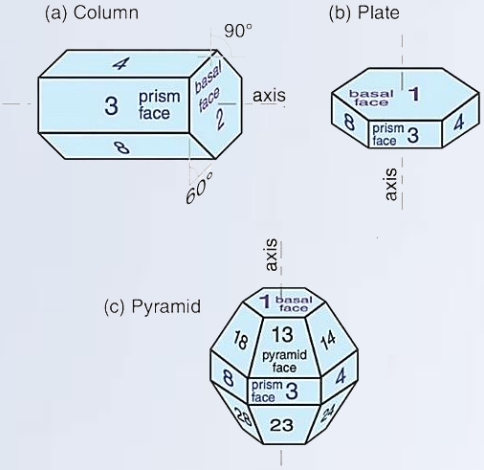

৪৬° হালো : ২২° হালোতে আমরা দেখেছিলাম আলো প্রিজমে প্রবেশ নির্গত হয় কিন্তু ৪৬° হালো তে আলো প্রিজমে প্রবেশ করে ঠিকই কিন্তু নির্গত মূখ দিয়ে। ৪৬° হালো ২২° হালো এর মতো সহজে দেখা যায় না। (কেন ভাবুন তো) আবার ৪৬° হালো ২২° হালো এর তুলনায় খুবই অনুজ্জ্বল হয়।

২২° হালো বোঝার পদ্ধতি: ধরুন কোন একদিন সূর্যের চারপাশে আপনি হালো দেখতে পেলেন। ওটা ২২° হালো কিনা তা বোঝার জন্য কোন বস্তু দ্বারা সূর্যকে আড়াল করুন। এরপর ঐ বস্তুটির উপর বৃদ্ধাঙ্গুলি রেখে হাত যথাসম্ভব প্রসারিত করুন। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে হাতের তালু এভাবে প্রসারিত করলে তা প্রায় ২২° হয়। এভাবে ২২° হালো আলাদাভাবে চেনা যায়।
আরও বিভিন্ন ধরনের হালো হতে পারে। সেগুলোর কারণ হলো পিরামিড আকৃতির বরফ স্ফটিক। সেগুলোর আকৃতি একটু জটিল ধরনের এবং এ ধরনের বরফ স্ফটিক দিয়ে হালো তৈরি হওয়া খুবই দুর্লভ।

লেখকঃ আখতারুজ্জামান সন

প্রশ্ন: হিপনিক জার্ক কী?

উত্তর: গভীর তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্নে আমরা অনেক উপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছি, পুরো শরীরে বিদ্যুতের মতো একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভেঙে গেল বা ঘুম হালকা হয়ে এল এমন অনুভূত হয়। এসবটা হওয়ার কারণ কী?

হিপনিক জার্ক, যার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় তন্দ্রাবস্থায় পড়ে যাওয়া বা ঝাঁকুনির অনুভূতি। এটিকে মায়োক্লোনিক জার্কও (Myoclonic Jerk) বলা হয়।
হিপনিক জার্ক বা তন্দ্রাবস্থায় পড়ে যাওয়া বা ঝাঁকুনির অনুভূতি হলো তন্দ্রাচ্ছন্ন শরীরে পেশিগুলো ধীরে ধীরে অবশ হতে থাকে, এবং মস্তিষ্ককর্তৃক শরীরের পেশির এই কার্যক্রম বুঝে উঠতে না পেরে প্রক্রিয়াটিকে থামানোর প্রচেষ্টার ফল। অনেকসময় নাক ডাকার দরুন হিপনিক জার্ক বা তন্দ্রাবস্থায় ঝাঁকুনির অনুভূতি হয়ে থাকে, কারণ স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনাপ্রবাহ ঠিকমতো মস্তিষ্ক ঠাহর করতে পারে না। প্রায় ৭০% মানুষ তাদের জীবনে কমপক্ষে একবার হিপনিক জার্ক অনুভূতির অভিজ্ঞতা পায়।
তন্দ্রাবস্থায় ঝাঁকুনির অনুভূতি কোনো স্নায়বিক সমস্যার কারণে হয় না। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, ঘুমের প্রাক্কালে ক্যাফেইন বা নিকোটিনজাতীয় খাবার গ্রহণ, অবসাদ বা নিত্যদিনের ঘুমের শিডিউলের অনিয়ম ঘটলে এটি বেশি দেখা দেয়। এছাড়াও, শরীরে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও আয়রনের ঘাটতি, ঘুমানোর পূর্বে শরীরচর্চা করলেও এটি হতে পারে।

নিকোটিন বা ক্যাফেইন জাতীয় উদ্দীপক গ্রহণ কমিয়ে দেওয়া, সময়মতো ও পরিমিত ঘুমের অভ্যাস করলে, দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করলে, দুশ্চিন্তামুক্ত থাকলে, বেশি বেশি ক্যালসিয়াম,

ম্যাগনেশিয়াম, আয়রনসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করলে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। তারপরও যদি তন্দ্রাবস্থায় ঝাঁকুনি থেকে পরিত্রাণ না মেলে, তাহলে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত।

লেখক: নজরুল ইসলাম নাহিদ

প্রশ্ন: ব্রণ কেন হয়?

উত্তর: আমাদের ত্বকের নিচে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থি আছে। এর মধ্য একটি হলো সেবাসিয়াস গ্রন্থি (sebaceous gland)। এই গ্রন্থির কাজ হলো 'সেবাম' নামক এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে আমাদের ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখা। যাতে ত্বক শুষ্ক বা রুক্ষ হয়ে না যায়। এখন প্রশ্ন হলো সেবাম কিভাবে আমাদের ত্বকের উপরিভাগে এসে আর্দ্রতা রক্ষা করে?

এর উত্তর হলো লোমকূপ। কারণ লোমকূপের নিচেই আমাদের সেবাসিয়াস গ্রন্থি গুলোর অবস্থান। লোমকূপ দিয়ে যে শুধু সেবাম বাইরে আসে তা কিন্তু নয়। এই লোমকূপ দিয়ে ঘাম এবং ত্বকের মৃত কোষও বাইরে বেরিয়ে আসে।

এখন কোনো কারণে যদি সেবাসিয়াস গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত সেবাম ক্ষরণ হয় বা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মৃত কোষ বাইরে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে তখন সেবাম এবং ত্বকীয় মৃত কোষগুলো মিলে লোমকূপের মধ্যে জমাট বেঁধে যায়। এতে লোমকূপ যায় বন্ধ হয়ে। একদিকে গ্রন্থি হতে সেবাম তৈরি হতে থাকে কিন্তু অন্যদিকে লোমকূপ বন্ধ থাকার ফলে তা বাইরে আসতে পারে না।

এরপর আমাদের অতি প্রিয় কিছু ব্যাকটেরিয়া ('প্রিয়'বলার কারণ হচ্ছে, আমাদের ত্বকে কিছু উপকারি ব্যাকটেরিয়া বাস করে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তারা আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে যেমন এই ক্ষেত্রে। শুধু ত্বকেই না, আমাদের দেহের বিভিন্ন জায়গায় আরো অনেক উপকারি ব্যাকটেরিয়া বাস করে।) উক্ত স্থান পরিদর্শন করতে আসে। এবং সেবাম সমৃদ্ধ এই জায়গাটি তাদের পছন্দও হয়ে যায়।

এরপর যা হওয়ার তাই হয়। শুরু হয় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ। লোমকূপগুলো ফুলে ফুলে ত্বকে দেখা দেয় নানারকম পাহাড়-পর্বত। যেসব ব্রণের ক্ষেত্রে ইনফেকশন হয় সেগুলোতে সৃষ্টি হয় পুঁজ। কমেডন, ব্ল্যাকহেড, ওয়াইটহেড, প্যাপিউল, নডিউল ছাড়াও আরো বিভিন্ন নামের ব্রণ দেখা যায়। ব্রণের সবচেয়ে সাধারণ জায়গা হলো মুখমন্ডলীয় এলাকা। এছাড়াও গলা, বুক এবং পিঠেও ব্রণ হতে পারে।

লেখক: মোহাম্মদ নাইম

প্রশ্ন: ব্রণ কাদের ব্রণ বেশি হয়?

সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালেই ব্রণ সবচেয়ে বেশি হয়। কারণ এ সময়ে অ্যান্ড্রোজেন নামক একপ্রকার হরমোন ক্ষরণের ফলে সেবাসিয়াস গ্রন্থি গুলো বড় হয় এবং অতিরিক্ত সেবাম নিঃসরণ করে। ফলে ব্রণের হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধিকালের পর ব্রণ চলে যায়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে স্ট্রেসের সাথে ব্রণের সম্পর্ক রয়েছে। স্ট্রেসের ফলে ব্রণ না হলেও স্ট্রেস ব্রণের তীব্রতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। একারণে দেখা যায় যখন আমরা বেশি চিন্তিত থাকি (যেমন পরিক্ষার আগে শিক্ষার্থীরা) তখন ব্রণের প্রকোপ বেড়ে যায়।

এছাড়াও অনিদ্রা, বিভিন্ন ধরণের কসমেটিকস কিংবা খাবারের কারণেও ব্রণ হতে পারে। অনেকে ব্রণ হলে তা খুঁটিয়ে ফেলেন। যা মোটেও উচিত নয়। এতে ত্বকে স্থায়ী বা অস্থায়ী দাগ হয়ে যেতে পারে।

ব্রণ হলে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার

নিয়মাবলী কঠোর ভাবে মেনে চলার পাশাপাশি একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত। ব্রণের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে একজন ডাক্তার বিভিন্ন ক্রিম, লোশন বা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মেনে উক্ত ঔষধ সমূহ গ্রহণ করতে হবে।

লেখক: মোহাম্মদ নাইম

প্রশ্ন: মেরু অঞ্চলে বস্তুর ওজন বেশি কেন?

উত্তর: আমরা জানি, ওজন W=mg; এখানে m=বস্তুর ভর এবং g=অভিকর্ষজ ত্বরণ। বস্তুর ভর একটি ধ্রুব রাশি ; সুতরাং, কোনো বস্তুর ওজন এর অভিকর্ষজ ত্বরণ এর উপর নির্ভরশীল। যে স্থানে বস্তুর অভিকর্ষীয় ত্বরণ বেশি,সে স্থানে বস্তুর ওজনও বেশি।আর যে স্থানে অভিকর্ষীয় ত্বরণ কম সে স্থানে বস্তুর ওজনও কম।

বিষুবরেখার চেয়ে মেরুতে একটি বস্তুর ওজন বেশি।কারণ, পৃথিবী একটি নিখুঁত গোলক নয়, তবে এটি মেরূতে চ্যাপ্টা। নিরক্ষরেখা এবং পৃথিবীর কেন্দ্র এবং মেরূগুলির মধ্যে দূরত্ব কম।

মেরু অঞ্চলে বস্তুর অভিকর্ষজ ত্বরণ বেশি। সুতরাং,মেরু অঞ্চলে বস্তুর ওজন বেশি। বিষুব অঞ্চলে অভিকর্ষীয় ত্বরণ কম, সেহেতু বিষুব অঞ্চলে বস্তুর ওজনও কম। পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ শূন্য। অতএব, পৃথিবীর কেন্দ্রে বস্তুর কোনো ওজন নেই।

অন্যদিকে, অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের উপর নির্ভর করে,যার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে g এর মান পরিবর্তিত হয়। মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R সবচেয়ে কম বলে সেখানে g এর মান সবচেয়ে বেশি। যার ফলে মেরু অঞ্চলে বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। সুতরাং, মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষ বলের প্রভাব বেশি থাকায় সেখানে বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি।

আবার, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে নিরক্ষরেখার দূরত্বের চেয়ে মেরুর দূরত্ব কম হওয়ায় বিষুবরেখার তুলনায় মেরূতে শরীরের উপর আকর্ষন বল বেশি। তাই বিষুবরেখার চেয়ে মেরুতে শরীরের ওজন বেশি।

আমরা জানি, বস্তুর ওজন হলো সেই শক্তি যার সাহায্যে এটি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে নিরক্ষরেখার দূরত্বের চেয়ে মেরুর দূরত্ব কম হওয়ায় বিষুবরেখার তুলনায় মেরুতে বস্তুর উপর আকর্ষন বল বেশি। তাই বস্তুর ওজন বেশি।

তাই মহাকর্ষ বল বিষুব রেখার চেয়ে বেশি এবং তাই বিষুবরেখার চেয়ে মেরুতে এর ওজন বেশি।

লেখক: মোঃ জোনায়েদ আলী

প্রশ্ন: টর্চলাইট এর আলো সর্বোচ্চ কত দূর যেতে পারে?

উত্তর: আচ্ছা, আমাদের মনে কি কখনো এই প্রশ্ন জেগেছে যে আকাশের দিকে তাক করে যদি টর্চলাইট ধরি সেটা আসলে পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারবে কিনা? আবার সূর্যের আলো যেমন পৃথিবীতে আসে তেমনি পৃথিবী থেকে লেজার বা টর্চ তাক করলে সেটা সূর্যে যাবে কিনা? বা আলো আসলে কত দূরে যেতে পারে?

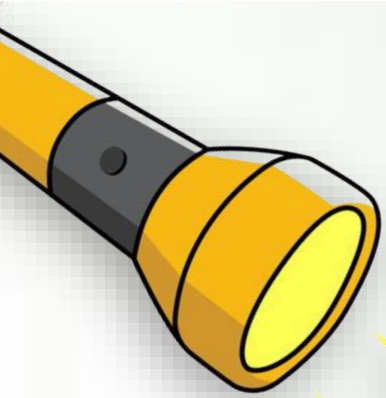

আশ্চর্য হলেও সত্যি, আলো আসলে আজীবন চলতে থাকে! জ্যোতির্বিদরা ১২ বিলিয়ন বছর আগের আলো শনাক্ত করতে পেরেছেন যা কিনা আমাদের মহাবিশ্বের বয়সের প্রায় সমান! কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে টর্চ এর আলো একটু দূরে গেলে আমরা দেখতে পাই না কেন? আলো আসলে আজীবন চলতে থাকে, যদি না সে কোন কিছু দ্বারা শোষিত হয়ে যায়। বায়ুমণ্ডল এর অনেক পদার্থ, চারপাশের বস্তু দ্বারা আলো শোষিত হয়ে যাওয়ায় টর্চের আলো বেশি দূরে যেতে পারে না। তা ছাড়া আমাদের চোখের সিমাবদ্ধতা এর কারনেও আমরা বেশি দূরের আলো দেখতে পাই না।

একটা নির্দিষ্ট উজ্জলতার কম উজ্জলতা সম্পন্ন আলো আমাদের চোখ গ্রহন করতে পারে না। তবে অনেক প্রাণীই অনেক কম উজ্জ্বলতায় দেখতে পারে, যেটা আমারা পারি না। আর টর্চের আলো যেমন শোষিত হয়ে যায় তেমনি ছড়িয়েও যায়। তাই দুরত্ব বাড়ার সাথে সাথে এর উজ্জলতাও কমতে থাকে। একর ক্ষমতা, মানে বেশি উজ্জ্বল আলো তৈরির ক্ষমতা বেশি সেই টর্চ দিয়ে আমরা তত বেশি দূরের জিনিস দেখতে পাই। মজার বিষয় হল, মহাশুন্যে যদি একটা টর্চ আমরা অন করি তাহলে সেই আলো আজীবন ধরে যেতেই থাকবে যতক্ষণ না অন্য কিছু দ্বারা সেটা শোষিত হয়ে যায়! আলর এই ধর্মের জন্যই মহাবিশ্বের শুরুর দিকের কিছু আলো এখনও কোন কিছু দ্বারা শোষিত না হওয়ায় আমরা শনাক্ত করতে পারছি! আপনি আকাশের দিকে তাক করে একটা লেজার বা টর্চ অন করুন, হয়তো তার কোন একটা ফোটন (আলর কণা) কোন কিছু দ্বারা শোষিত না হয়ে মহাশুন্যে ছড়িয়ে পরবে, আর হয়তো কোন একদিন কোটা নির্দিষ্ট উজ্জ্বলতার পরে আর আমরা সেটা দেখতে পাই না। তাই যে টর্চেন মানুষ বা ভিনজাগতিক প্রাণী সেটা গ্রহন করে এই সময় সম্পর্কে অনেক তথ্যও পেতে পারে।

লেখক: দ্বীন ইসলাম

প্রশ্ন: বর্গকিমি: দেশের আয়তন, নাকি ক্ষেত্রফল?

উত্তর: "বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার " - একথা আমরা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ে ছোটবেলা থেকেই পড়ে আসছি। কিন্তু এই তথ্য পড়ার পর মনে হয়তো এই প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে, "আচ্ছা, দেশের ভূমির পরিমাপকে আয়তন না বলে ক্ষেত্রফল বলা হচ্ছে কেন?" প্রথমে জেনে নেওয়া যাক এ বিষয়ে কিছু ভুল ধারণা এবং তাদের বিপক্ষে যুক্তি সম্পর্কে।

[×] ভূল ধারণা ০১: আয়তন আর ক্ষেত্রফল তো প্রায় সমার্থক। এজন্যই ক্ষেত্রফলের বদলে আয়তন লেখা হয়েছে কি?
না। আয়তন আর ক্ষেত্রফল শব্দ দুটো সমার্থক নয়। অন্ততপক্ষে গণিত আর বিজ্ঞানে তো নয়-ই!

[×] ভূল ধারণা ০২: একটা দেশ তো শুধু ভূমি নিয়েই হয়না। সাথে আকাশসীমাও থাকে। সেই আকাশসীমাকে সাথে নিয়েই বিষয়টাকে আয়তন বলা যায় না?
এর উত্তরও না। আয়তন বলতে বোঝায় তিনটি মাত্রার গুণফল, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা। এজন্য এর একক m^3 বা ঘনমিটার। আমাদের বইয়ে একক হিসেবে আমরা বর্গমিটারই দেখে এসেছি।

[×] ভূল ধারণা ০৩: আকাশ সীমার উচ্চতা হিসেবে এক কিলোমিটার ধরা হয়। এজন্য নাকি ক্ষেত্রফল আর আয়তনের পরিমাণ বদলায় না।

এই ধারণায় বড় রকমের একটা ভূল আছে। ভূমি থেকে এক কিলোমিটার পর্যন্ত আকাসসীমা বা বায়ুমন্ডলের উচ্চতা বিবেচনা করার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। আর, অযৌক্তিক জিনিস অযথা আমরা পরিমাপ করবো কেন? আবার বায়ুমণ্ডলের প্রকৃত উচ্চতাকে গণণায় নিয়ে আসাও ছাত্রছাত্রীদের জন্য ঝামেলার। বায়ুমন্ডলের ব্যাপ্তি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে।

[×] ভূল ধারণা ০৪: হয়তো... মাটির গভীরতাকে যুক্ত করা হয়?
এটা বেশ ভালো একটা প্রশ্ন। কিন্তু, এই ভ্রান্তধারণাকে "ভূল ধারণা ০২" এর যুক্তি দিয়েই ভাঙা যায়।

তাহলে, সঠিক সমাধান কী এই প্রশ্নে?
- পুরো বিষয়টাই একটা বড় অনুবাদজনিত ভুল। প্রথম যখন কোনো এক অনুবাদক এই বিষয়ে লিখছিলেন, তিনি হয়ত 'ক্ষেত্রফল' শব্দটাকে ভুল করে 'আয়তন' লিখে ফেলেছিলেন। আর, সেই ভুলটাই বয়ে বেড়াচ্ছি আমরা!

এই ভুল ভাঙায় আমরা কী করতে পারি?
- আয়তন কথাটা যে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা অনুচিত - এই মেসেজটা আমাদের সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। ঠিক যেভাবে নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে যুক্তি ছড়িয়ে পড়েছে, সেভাবেই! আর, বোধ করি পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টাকে সংশোধন করে নিলে আর কোনো সমস্যা থাকবেনা আমাদের মাঝে।

লেখক: হিমেল দাস

প্রশ্ন: পৃথিবী প্রচন্ড বেগে ঘুরছে, তবুও আমরা ছিটকে যাই না কেন?

উত্তর: জীবনের কোনো না কোনো সময় আমরা হয়ত নাগোর দোলায় চড়েছি। নাগোরদোলা ঘুরতে শুরু করার পর আমাদের দেহের একদিকে ছিটকে যাওয়ার প্রবণতার সাথেও আমরা পরিচিত। নাগোরদোলার চেয়ারের বাঁধা না থাকলে আমরা নিশ্চিত ছিটকে পড়ে যেতাম। তবে মজার ব্যাপার হলো পৃথিবীও কিন্তু আমার দিয়ে নাগোর দোলার মতো প্রচন্ড বেগে ঘুরছে। তবুও আমরা ছিটকে যাচ্ছি না কেন?

আমাদের মাঝে যে ছিটকে যাওয়ার প্রবণতা কাজ করে সেটি মূলত হয় জড়তার কারণে। কোনো কাঠামো বৃত্তাকার পথে ঘুরতে শুরু করলে ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করলেও তার ভেতরে থাকা বস্তুগুলো আগের অবস্থানের দিকেই গতিশীল থাকতে চায়। ফলে কাঠামোর ভেতর থাকা বস্তুগুলোর মধ্যে ক্রমাগত একদিকে ছিটকে যাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

এখন প্রশ্ন হলো আমরা পৃথিবী নামক ক্রমাগত বৃত্তাকার পথে আবর্তিত কাঠামোর উপরিভাগে অবস্থান করলেও ছিটকে যাওয়া তো দূরে থাক, কোনো দিকে ছিটকে যাওয়ার প্রবণতাটুকুকেও কেন অনুভব করতে পারি না? এর মূল কারণ হলো অভিকর্ষ বল। আমরা জানি অভিকর্ষ বলের কারণেই আমরা পৃথিবীর উপরিভাগে আটকে থাকি এবং ওজন অনুভব করি। আর সেই একই কারণে প্রচন্ড বেগে পৃথিবী ঘুরলেও আমরা ছিটকে যাই না কিংবা সেই বেগ অনুভব করতে পারি না।

লেখক: জাকিয়াতুল জান্নাত

প্রশ্নঃ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬০০০ কি.মি. হলে বিমান এবং স্যাটেলাইটে করে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে আলাদা আলাদাভাবে কত সময় লাগবে?

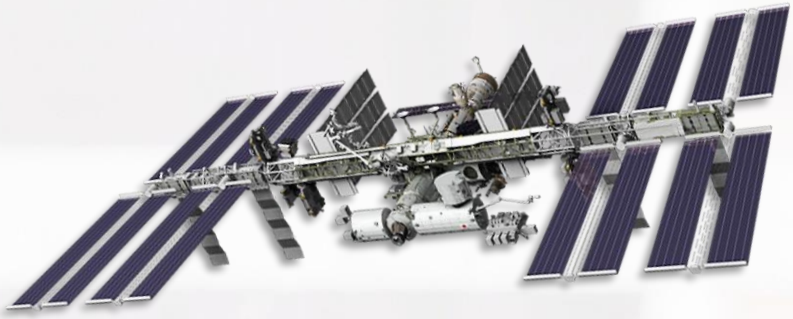

উত্তর: বিমান আমাদের বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ার ও তার একটু উপর দিয়ে চলাচল করে। এই স্তরে চলার কারণ হলো হালকা বায়ুমণ্ডলের চলাচলে বিমানের ঘর্ষণ একটু কম হয়, এজন্য কিছু জ্বালানী সাশ্রয় হয়। স্যাটেলাইটের কথা বলতে গেলে এটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটারের উপরে চলাচল করে। এই স্তরটি হলো থার্মোস্ফিয়ার। বায়ুমণ্ডলের এই স্তর দিয়ে অভিকর্ষ বল পৃথিবীর নিম্নভাগের মতো হলেও, এখান দিয়ে ঘর্ষণ অনেক কম, কেননা এখানে বাতাসের ঘনত্ব খুবই কম হয়ে থাকে। এজন্য এই স্তর দিয়ে স্যাটেলাইট চলাচলে সাধারণত একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথ বজায় রাখতে পারে।

এবারে তুলনা করি, ঘর্ষণ বল স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে কম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এটা বিমানের চেয়ে দ্রুত পৃথিবী ঘুরে আসতে সক্ষম হবে। আবার স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে তার গতিবেগও হয় অত্যধিক। এজন্যই মূলত বিমানের চেয়ে স্যাটেলাইটের পুরো পৃথিবী একবার চক্কর দিয়ে আসতে অনেক কম সময় লাগবে।

এবার চলুন গণিতের হিসাবনিকাশ করি। বিমানের ক্ষেত্রে আমরা জানি, বাণিজ্যিক বিমানগুলো সাধারণত প্রায় ৪০০০০ ফিটের (১২১৯২ মিটার) কাছাকাছি দূরত্বে চলাচল করে। এখানে সময় হিসাব করতে আরও একটি জিনিস লাগবে, তা হলো 'বিমানের বেগ'। বিমানের বেগ অনেক ক্ষেত্রেই "Mach Number" দিয়ে হিসেব করা হয়। Mach Number আসলে বিমানের বেগ ও শব্দের বেগের অনুপাত। অর্থাৎ, যদি কোনো বিমান 3 Mach-এ চলে, তাহলে, এর আসল বেগ অনেকটা 1029 m/s বেগের কাছাকাছি। এখান থেকে একটা সূত্র দাঁড় করানো যায়। আর তা হলো:

$$tap = 2\pi \times (R + h) / (n \times v) \dots \dots \dots (1)$$

কিন্তু এর মানে কী? প্রথমে দেখি লবের দিকে, এখানে পৃথিবীকে একটি সুষম গোলক ধরে এর মাঝ বরাবর বিমান অতিক্রমের বিষয় ধরে নেওয়া হয়েছে, এবং সে বরাবর পরিধি বিবেচনা করা হয়েছে, এবং R দিয়ে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ও h দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও, n হলো Mach Number, আর v হলো শব্দের বেগ। আমরা এখানে Mach 6-এর জন্য হিসেব করলে পাই, ৫ ঘণ্টা ৫ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড। এখানে উল্লেখ্য, পৃথিবীতে সর্বোচ্চ 20 Mach-এর উড়োযান রয়েছে, যা মূলত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বিমানগুলোর জন্য তা হিসাব করলে প্রায় ৪৫-৫৫ ঘণ্টার কাছাকাছি পাওয়া যায়।

এখন স্যাটেলাইটের ব্যাপারে একটু সাধারণভাবেই চিন্তা করুন। এটির গতি অনেক বেশি, যার কারণে স্বাভাবিকভাবেই এটি দ্রুত প্রদক্ষিণ করার কথা। একটি স্যাটেলাইট একবার পৃথিবী ঘুরে আসতে যে সময় নেয়, সেটিকে তার অরবিটাল পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে। এই অরবিটাল পিরিয়ড হিসাবের জন্য কেপলারের তৃতীয় সূত্র ব্যবহার করা যায়। এই সূত্র অনুযায়ী,

$$T = 2\pi \times \sqrt{(a^3 / GM)} \dots \dots \dots (2)$$

স্যাটেলাইট কখনই সম্পূর্ণ বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না, বরং একটি উপবৃত্তাকার গতিপথ অনুসরণ করে। এই সূত্র যে-কোনো উপবৃত্তের জন্য সত্য। একটি উপবৃত্তের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো

এর ব্যাসার্ধ। এর ব্যাসার্ধ একদিকে একটু বেশি এবং অন্যদিকে একটু কম হয়ে একটি প্রতিসম গঠন তৈরি করে। এর বড়ো ব্যাসটিকে বলা হয় বৃহৎ অক্ষ (Major Axis) এবং অন্যটিকে বলা হয় ক্ষুদ্র অক্ষ (Minor Axis)। আর তাই এদের অর্ধেক, অর্থাৎ ব্যাসার্ধকে বলা হয় যথাক্রমে উপ-বৃহৎ অক্ষ (Semi-Major Axis) ও উপ-ক্ষুদ্র অক্ষ (Semi-Minor Axis)। এখানে সূত্রটিতে, a দিয়ে এই উপ-বৃহৎ অক্ষকে বোঝানো হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, সাধারণত প্রায় বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কখনোই মানুষ নিজে নিম্ন কক্ষপথ (Low Earth Orbit), যা ভূ-পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত পৃথিবীর ব্যাসার্ধের এক-তৃতীয়াংশ, পার হয়নি। এর মধ্যেই রয়েছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন, যা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থিত। তাই এই সূত্রটিকে আমাদের স্যাটেলাইটের জন্য চিন্তা করলে পাই—

$$trkt = 2\pi \times \sqrt{((R + h)^3 / (GM))} \dots \dots \dots (3)$$

এখানে যদি চলকসমূহের উপযুক্ত মান নেই এবং h তথা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৪০০ কিলোমিটার ধরি, তাহলে আমরা সময় পাই প্রায় ৮৪ মিনিট অর্থাৎ প্রায় ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ৫৫.৪৩ সেকেন্ড। আপনারা দেখতেই পারছেন যে নিঃসন্দেহে একটি স্যাটেলাইট 20 Mach-এর একটি বিমান থেকেও অনেক দ্রুত পুরো পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবে।

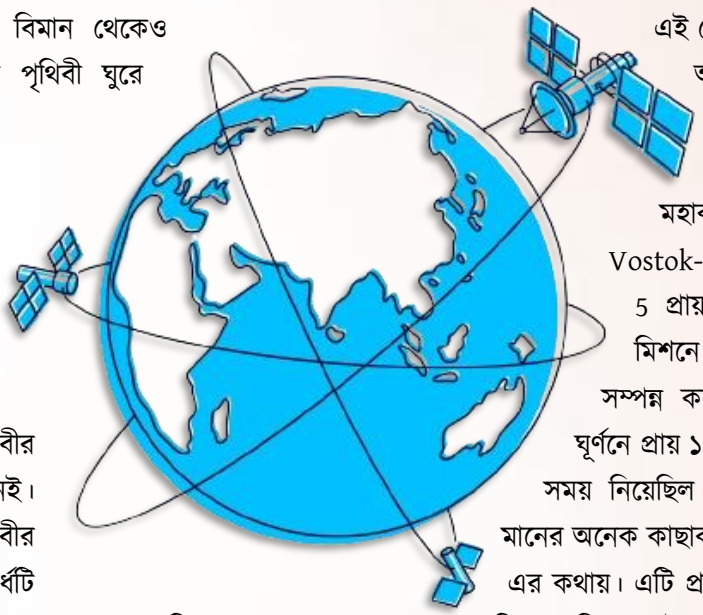

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে। এখানে GM এর মান তো আর আমাদের 6000 km ব্যাসার্ধের পৃথিবীর জন্য হিসেব করা নেই। তাই আমাদের পৃথিবীর 6371 km ব্যাসার্ধটি নিয়েছি। তাহলে এখানে কেমন ত্রুটি আসতে পারে? আসলে এখানে আমরা ব্যাসার্ধের পার্থক্যকে নগণ্য ধরে নিয়েছি। এখানে হয়তোবা মান আরও অন্যরকম আসত, কিন্তু আপাতত ওটা আমাদের হিসাবের বাহিরে, তাই আমরা এতটুকু ত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।

এবার পরিসংখ্যানের দিকে নজর দেই একটু।
প্রথমে আসি বিমান-এর হিসাবে। চলুন আমাদের পরিচিত Boeing 747-8-এর উদাহরণই দেওয়া যাক। Boeing 747-8-এর ক্ষেত্রে যদি একে নিরবচ্ছিন্নভাবে আকাশে থাকতে দেওয়া হতো, তবে এর ৪৫ ঘণ্টার কাছাকাছি সময় লাগত। ১৯৭৬ সালে একবার Boeing 747SP নিউইয়র্ক থেকে দিল্লি গিয়ে আবার সেখান থেকে ফিরে এসেছিল প্রায় ৪৭ ঘণ্টায়। যদিও সেটি সত্যিকার অর্থে পুরো পৃথিবীকে ঘুরে আসেনি, কিন্তু অনেকটাই তার সমান দূরত্ব অতিক্রম করে। বাস্তবিকভাবে, যদি Boeing 747-8-কে পুরো পৃথিবী ঘুরে আসতে হতো এবং জ্বালানির জন্য কোথাও থামতে না হতো, তাহলে এটি প্রায় ৪০ ঘণ্টায় পুরো পৃথিবী ঘুরে আসতে পারত। যদি যুদ্ধবিমানের কথা বলি? ধরি F22 Raptor-এর কথা। একটি F22 Raptor নিরবচ্ছিন্নভাবে চললে পুরো পৃথিবী প্রায় ১৭ ঘণ্টায় ঘুরে আসতে পারবে। কিন্তু এর জন্য একে অনেকবার জ্বালানী নিতে হবে (কমপক্ষে ১৫ বার!)। যার কারণে এর প্রায় ২২-২৫ ঘণ্টা সময় লাগার কথা পুরোপুরি হিসেবে।

এই তো গেল বিমানের কথা। এবার আসি স্যাটেলাইটের কথায়। আনা যাক মহাকাশ ইতিহাসের প্রথম কিছু মহাকাশযানের কথা, রাশিয়ান Vostok-5 ও Vostok-6 । Vostok-5 প্রায় ৪ দিন ২৩ ঘণ্টা ৭ মিনিট মিশনে ছিল, এবং প্রায় ৮২ বার ঘূর্ণন সম্পন্ন করেছিল। তাহলে গড়ে প্রতিটি ঘূর্ণনে প্রায় ১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ৯.৫১ সেকেন্ড সময় নিয়েছিল। এটি আমাদের হিসাব করা মানের অনেক কাছাকাছি। এবার আসি Vostok-6-এর কথায়। এটি প্রায় ২ দিন ২২ ঘন্টা ৫০ মিনিট মিশনে ছিল। এই সময়ে এটি প্রায় ৪৮টি ঘূর্ণন সম্পন্ন করে। হিসাব করলে গড়ে প্রায় প্রতিটি ঘূর্ণনে ১ দিন ২৮ মিনিট ৩২.৫ সেকেন্ড সময় লেগেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ঘূর্ণন বলতে অরবিট করাকে বোঝানো

হয়েছে। এখানে আধুনিক সব স্যাটেলাইটগুলোর মধ্যে বলা যাক SpaceX Crew-5-এর কথা। এটি ৫ অক্টোবর, ২০২২ সালে চালু হয়ে প্রায় ১৫৭ দিন ১০ ঘণ্টা ১ মিনিট মিশনে ছিল। এ সময়ে এটি প্রায় ২৫১২টি ঘূর্ণন সম্পন্ন করে (!)। এ থেকে হিসাব করলে পাওয়া যায় যে, প্রতিটি ঘূর্ণনে প্রায় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ১৪.৩৫ সেকেন্ড সময় লেগেছিল।

পরিশেষে, এখানে আমরা যেমন গণিতের সাহায্যে বিষয়টি দেখলাম, তেমনি পরিসংখ্যান থেকেও তাই দেখলাম। অর্থাৎ এ থেকে বলা যায়, আসলেই এখানে স্যাটেলাইট বেশি দ্রুত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে।

লেখক: মোহাম্মদ কামরুল হাসান

প্রশ্ন: শীতকালে নারিকেল তেল জমে শক্ত হয়ে যায় কেন?

উত্তর: নারিকেল তেল মূলত ফ্যাটি অ্যাসিড। এতে স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত এবং আনস্যাচুরেটেড বা অসম্পৃক্ত উভয় ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড বিদ্যমান থাকে। শতকরা হিসেবে সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ ৯০% এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ ১০%।

দেখা যাচ্ছে নারিকেল তেলে সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি। নিম্ন তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড জমতে শুরু করে। এর দীর্ঘ কার্বন শিকলের সাথে হাইড্রোজেন পরমাণু বিদ্যমান। হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো অন্যান্য অণুসমূহের সাথে ভ্যান্ডারওয়ালস বল দ্বারা আকর্ষিত হয়। অণুসমূহের মধ্যে এই বন্ধনের কারণে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা যখন হ্রাস পায় পদার্থ কঠিন অবস্থা লাভ করে। এই ভাঙনে অধিক তাপের প্রয়োজন হয়। তাই দেখা যায় শীতকালে জমে যাওয়া নারিকেল তেলকে তাপে উত্তপ্ত করে তরল অবস্থায় আনা হয়।

অন্যদিকে, যে-সকল যৌগে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি সে-সকল যৌগে ভ্যানডারওয়ালস বলের প্রভাব কম থাকায় কক্ষ তাপমাত্রায় সাধারণত তরল অবস্থায়ই থাকে এবং নিম্ন তাপমাত্রায় জমে না, যেমন: সয়াবিন তেল।

সুতরাং নারিকেল তেলে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের আধিক্য থাকায় গলনাঙ্ক সাধারণত বেশি হয়। তাই শীতকালে তাপমাত্রা হ্রাস পায় বিধায় নারিকেল তেল জমতে শুরু করে।

লেখক: রিয়াশাদ আকবর হায়দার

প্রশ্ন: পৃথিবীতে কোনো অণুজীব না থাকলে মানুষের পুষ্টি ও বিপাক প্রক্রিয়ায় কোনো সমস্যা দেখা দিত কি?

আচ্ছা ভেবে দেখি তো, যদি পৃথিবীতে কোনো অণুজীব না থাকত, সবই যদি দৃশ্যমান হতো তাহলে কেমন হতো? আদৌ কি আমাদের মানবজাতির অস্তিত্ব থাকত?

শুধু এটাই ভেবে দেখুন, মানুষের পুষ্টি ও বিপাক ক্রিয়ায় কোনো সমস্যা হতো কি না!

উত্তর হলো, হ্যাঁ । মানুষের বিপাক ক্রিয়ায় কোটি কোটি অণুজীব ভূমিকা রাখে । একইসাথে তারা ভূমিকা পালন করে পুষ্টি প্রক্রিয়ায়। আমরা যে খাবার খাই তার পরিপাক মুখগহ্বর থেকে শুরু করে পাকস্থলী ও অন্ত্র পর্যন্ত চলে। বিভিন্ন ধরনের উপকারী ব্যাকটেরিয়া, আবারও বলছি , "উপকারী" ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত থাকে খাবার পরিপাক এবং তা থেকে পুষ্টি সরবরাহ করার জন্য। তাদের কেউ শর্করা, কেউ আমিষ, এবং কেউ কেউ স্নেহজাতীয় খাবার পরিপাককার্যে নিয়োজিত। খাবারের কণাকে ভেঙে তা থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে তা সরাসরি রক্তে পৌঁছে দেয় এই উপকারী অনুজীবসমূহ। রক্ত ও লসিকার মাধ্যমে সারা দেহে উক্ত পুষ্টি উপাদানসমূহ পৌঁছে যায় দেহের প্রতিটি প্রান্তে বিদ্যমান কোষসমূহে। অতঃপর কোষের বিকাশ সাধন হয় এবং সর্বোপরি আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে এবং উন্নতি সাধন হয়। অণুজীবের অস্তিত্ব না থাকলে আমরা খাবার থেকে শক্তি ও পুষ্টি আহরণ করতে পারতাম না। উপরন্তু, খাবারে বিদ্যমান অপ্রয়োজনীয় ও

বিষাক্ত উপাদানগুলো আমাদের দেহে থেকে যেত, এতে মানবজাতির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হতো। বিপাক ক্রিয়ার অভাবে খাদ্য পাকস্থলীতে জমে আমাদের মৃত্যু হতো ।

অতএব, অণুজীব ছাড়া পুষ্টি ও বিপাক ক্রিয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

লেখক: জান্নাতুল নাইম

প্রশ্ন: রংধনু কেন বৃত্তাকার হয়?

উত্তর: বায়ুমণ্ডলে সূর্যের আলো ও পানির ফোঁটার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে আকাশে বৃত্তাকার আর্ক হিসেবে রংধনু দেখা যায়। যখন সূর্যালোক এই ফোঁটাগুলির মধ্য দিয়ে যায়, তখন প্রতিসরণের ফলে আলো বাঁকা হয়। আলো তখন ফোঁটার অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয় এবং একটি ভিন্ন দিকে প্রস্থান করে। এই গমন এবং প্রতিফলন প্রক্রিয়া সূর্যালোককে ছড়িয়ে দেয় এবং একটি বৃত্তাকার প্যাটার্ন তৈরি করে। বৃত্তের কেন্দ্রটি আকাশে সূর্যের সরাসরি বিপরীতে, এবং রংধনুর আকার জলের ফোঁটার আকার ও সূর্যের আলো যে কোণে প্রবেশ করে এবং প্রস্থান করে তার উপর নির্ভর করে।

লেখক: মুনেম শাহরিয়ার

প্রশ্ন: ভরদুপুরে কেন রংধনু দেখা যায় না?

উত্তর: একটি রংধনু দেখার জন্য শর্ত কী কী তা দেখি- প্রথমে সূর্যকে পর্যবেক্ষকের পিছনে থাকতে হবে এবং বৃষ্টির ফোঁটাকে পর্যবেক্ষকের সামনে থাকতে হবে। যখন সূর্যালোক বৃষ্টির ফোঁটায় প্রবেশ করবে, অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মধ্যে দিয়ে ফোঁটা থেকে বেরিয়ে গিয়ে রঙের একটি বৃত্তাকার আর্ক তৈরি করে, তখন বিচ্ছুরণের কারণে রঙধনুর নানান রং ছড়িয়ে পড়ে এবং রংধনু দৃশ্যমান হয়। এই বিচ্ছুরণ তৈরি করার জন্য আলোকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট কোণে বৃষ্টির ফোঁটায় প্রবেশ করতে হবে।

দুপুরে যখন সূর্য আকাশের মাঝামাঝি ৯০° কোণ বরাবর থাকে, তখন সূর্য, বৃষ্টির ফোঁটা এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যে কোণটি একটি রংধনু গঠনের জন্য বেশ বড়ো হয়ে যায়। সূর্যের আলো সরাসরি মাথার উপর থেকে আসছে এবং বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এবং আলোর বিচ্ছুরণের কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে যখন অসংখ্য বৃষ্টির ফোঁটা থাকে তখনই সাধারণত বৃষ্টির পর রংধনু দেখা যায়। দুপুরের সময় যখন আবহাওয়া সাধারণত শুষ্ক থাকে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকে, তখন সূর্যালোকের সাথে মিথস্ক্রিয়া এবং রংধনু গঠনের জন্য কম পানির ফোঁটা পাওয়া যায়। সংক্ষেপে সূর্যালোকের কোণ, পর্যবেক্ষকের অবস্থান এবং বৃষ্টির ফোঁটার অপ্রাপ্যতা হলো কিছু প্রাথমিক কারণ, যার জন্য আমরা সাধারণত দুপুরে রংধনু দেখতে পাই না। রংধনু দেখার উপযুক্ত সময় সকাল বা শেষ বিকেল, যখন সূর্যের আকাশের একদিকে ঢেলে পড়ে।

লেখক: তারুণ্য

প্রশ্নঃ শীতকালের চাইতে গরমকালে দই তৈরি করা সহজ কেন?

উত্তরঃ দই হচ্ছে দুধ থেকে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার (যেমন: ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া) গাঁজন প্রক্রিয়ার ফলে তৈরি এক প্রকার ঘন দ্রবণ। গ্রীষ্মে দই তৈরি করা সহজ হওয়ার কয়েকটি কারণ এখানে রয়েছে:

১) তাপমাত্রা: ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া উষ্ণ তাপমাত্রায় দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। গ্রীষ্মকালে আশেপাশের তাপমাত্রা সাধারণত বেশি থাকে, যা ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধি এবং দুধকে গাঁজন প্রক্রিয়ায় পচানোর জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। উষ্ণ তাপমাত্রা গাঁজন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যার ফলে দ্রুত দই তৈরি হয়।

২) গাঁজন: দই গঠনের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া বেশ সক্রিয় এবং উষ্ণ তাপমাত্রায় দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এই বর্ধিত ক্রিয়াকলাপের ফলে দ্রুত গাঁজন প্রক্রিয়া হয়, যেখানে ব্যাকটেরিয়া দুধের ল্যাকটোজকে খুব দ্রুত ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তর করে, যার ফলে দুধ দই হয়ে যায়।

৩) স্থিতিশীলতা: উষ্ণ তাপমাত্রা গাঁজন প্রক্রিয়ার জন্য আরও ভালো স্থিতিশীলতা প্রদান করে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় তাপমাত্রার ওঠানামা ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং দইয়ের সামঞ্জস্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

মূলত এই কয়েকটি মূল কারণে গ্রীষ্মকালে দই তৈরি সহজ।

লেখকঃ তারুণ্য

প্রশ্নঃ আমাদের শরীরের কোষের নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু কেন হয়? না হলে কী কী সমস্যা হতে পারে এবং কীভাবে আমরা এসব ক্ষতি ঠেকাতে পারি?

উত্তরঃ গাছের মৃত পাতা যেভাবে ঝরে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের দেহে কোষের পরিণতি হয়। যখন কোনো কোষের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন সঙ্কুচিত হয়ে অবশিষ্ট অংশগুলো কোনোরকম প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ফ্যাগোসাইটোসড হয়ে যায়। এটি কোনো অপরিকল্পিত কিংবা অনিয়ন্ত্রিত ঘটনা নয়। বরং এটি জেনেটিক্যালি অত্যন্ত পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত ঘটনা। এই ঘটনার নামটা বেশ মজার—

অ্যাপোপটোসিস (ἀπόπτωσις)। অ্যাপোপটোসিস মানে ঝরে পড়া। যেমনিভাবে গাছের মৃত পাতা ঝরে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের দেহে কোনো কোষ প্রবীণ হয়ে গেলে এরা আত্মহত্যা করে নবীন কোষকে জায়গা করে দেয়। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রতিদিন 10^11টি প্রবীণ কোষ মারা যায় এবং নবীন কোষ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। জেনে অবাক হবেন যে, কোষের স্বাভাবিক মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা প্রতি বছর যে পরিমাণ কোষ হারাই তা ওজন করলে আমাদের পুরো শরীরের ওজনের কাছাকাছি হবে!

অ্যাপোপটোসিস না হলে তো মহা সমস্যা। ক্যান্সার প্রতিরোধে অ্যাপোপটোসিসের গুরুত্ব অপরিহার্য। কোনো কারণে ঠিকঠাক সময়ে অ্যাপোপটোসিস না হলে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টিউমার সৃষ্টি হতে পারে। আর টিউমার থেকে মরণব্যাধি ক্যান্সার।

নিয়মিত ব্যায়াম, সুষম খাদ্যাভাস এবং ক্ষতিকারক পদার্থ (যেমন: তামাক, অ্যালকোহল, ইত্যাদি) এড়ানো-সহ একটি স্বাস্থ্যকর ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা বজায় রাখলে কোষের সামগ্রিক স্বাস্থ্য বজায় থাকে এবং প্রবীণ কোষের মৃত্যুর প্রক্রিয়া ও নবীন কোষের প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত থাকে।

লেখকঃ মোঃ কাউসার উদ্দিন আহমেদ

প্রশ্নঃ পৃথিবী এত জোরে ঘুরলে আমরা ছিটকে পরি না কেন?

উত্তরঃ আমরা পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে যাযই না, এর কারণ হলো পৃথিবী আমাদেরকে তার দিকে টানছে, আমরা কোনো বস্তুকে রশি দিয়ে ঠিক যেভাবে টানি সেভাবে। কিন্তু পৃথিবী আমাদেরকে টানে এক অদৃশ্য রশি দিয়ে। বিজ্ঞানী নিউটন সাহেব এই অদৃশ্য রশির নাম দেন গ্র্যাভিটি। এই গ্র্যাভিটির কারণে পৃথিবী আমাদেরকে

এনিমিয়া

প্রকট বংশগতি ব্যাধি

সিকেল সেল এনিমিয়া এমন একধরণের বংশগতি রক্তের ডিসওর্ডার বা ব্যাধি, যাতে পুরো পৃথিবীতে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত বর্তমানে। মানব শরীরে অক্সিজেন পরিবহন করে লোহিত রক্ত কণিকা। আবার এই অক্সিজেন পরিবহন করার জন্য দায়ী লোহিত রক্তকণিকার এক ধরনের প্রোটিন। এই প্রোটিনের নাম হলো গ্লোবিউলার প্রোটিন, যা হিমোগ্লোবিন গঠন করে থাকে। এই গ্লোবিউলার প্রোটিনের নির্দিষ্ট পরিবর্তন এর কারণে হিমোগ্লোবিন এর আকৃতির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা তৈরি হয়। যার ফলে শরীরের লোহিত রক্ত কণিকা দেখতে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি বা 'Sickle' আকৃতির হয়ে যায়।

এই এনিমিয়ার কারণে যেখানে লোহিত রক্তকণিকার গড় আয়ু ১২০ দিন বা তার কাছাকাছি থাকার কথা সেখানে এই সিকেল আকৃতির লোহিত কণিকাগুলো ১০ থেকে ২০ দিনের মধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ফলে নতুন রক্ত কণিকা তৈরি না হওয়ার আগে ধবংস প্রাপ্ত হওয়ায় তীব্র রক্তশূন্যতা সৃষ্টি করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর তথ্য অনুসারে, পৃথিবীতে প্রতিবছর আনুমানিক ১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে সিকেল সেল এনিমিয়ার জন্য।

আমরা এই আর্টিকেলে আলোচনা করবো সিকেল সেল এনিমিয়ার কারণ, লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং বর্তমানে এই রোগ নিয়ে চলমান গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়াদি।

সিকেল সেল এনিমিয়া কেন হয়

মানব রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে দুই ধরণের গ্লোবিউলার প্রোটিন আছে। একটা হলো আলফা গ্লোবিউলার, অন্যটি বিটা গ্লোবিউলার। গ্লোবিউলার প্রোটিন কোষের আকৃতি তৈরির জন্য দায়ী। মূলত লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিন এর বিটা গ্লোবিন চেইনে মিউটেশন রোগটি হওয়ার প্রধান কারণ। বিটা গ্লোবিন চেইনের ছয় নাম্বার পজিশনে থাকা একটি নির্দিষ্ট নিউক্লিওটাইড এডিনিন (A) প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় থায়ামিন (T) নিউক্লিওটাইড দ্বারা। এই প্রতিস্থাপনের কারণে তৈরি পরিবর্তনকে বলছি আমরা Substitution মিউটেশন। এই একটা কোডন-এর পরিবর্তন মোড় ঘুরিয়ে দেয় সবকিছুর। আগে যেখানে বিটা চেইনে GAA, GAG কোডন গ্লুটামিক অ্যাসিড Glutamic acid (অ্যামিনো অ্যাসিড) তৈরি করতো সেখানে এই প্রতিস্থাপনের দরুন GTT, GTA কোডন তৈরি হয়ে যায় যা সম্পূর্ণ নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড ভ্যালিন(Valine) তৈরি করে বিটা চেইনে। এই নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড লোহিত রক্তকণিকার বিটা গ্লোবিউলার প্রোটিন এর আকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে লোহিত কণিকাকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা সিকেল আকৃতির রূপ দেয়। স্বাভাবিক লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিনকে প্রকাশ করা হয় HBB দ্বারা আর এই মিউটেশন অবস্থাকে প্রকাশ করা হয় HBS দ্বারা। লোহিত কণিকা অর্ধচন্দ্রাকৃতি হওয়ার কারণে বিভিন্ন সরু রক্ত নালীর মধ্যে দিয়ে সহজেই যেতে পারার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ছোট ব্লাড ভেসেলগুলোর মধ্যে আটকে যায় এবং রক্ত জমাট বাধিয়ে ফেলে। বিভিন্ন কোষ, টিস্যুতে বা অঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহন করতে পারে না। ফলে আক্রান্ত ব্যাক্তি অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠে।

রোগের লক্ষণ

এই রোগের লক্ষণ সব সময় একরকম হয়না এটি নির্ভর করে মানুষের উপর। কেউ হালকা লক্ষণ অনুভব করতে

পারে আর কেউ অনেক গুরুতর জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে। সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ গুলোর মধ্যে আছে

•দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি

•শ্বাসকষ্ট

•জন্ডিস

•তলপেট, বুক বা জয়েন্টে তীব্র ব্যথা অনুভব করা(রক্ত কণিকা আটকে যায় সরু ব্লাড ভেসেলগুলোতে)

•হাত এবং পায়ে ঘামানো

•বৃদ্ধি বিলম্বিত হওয়া (লোহিত কণিকা অক্সিজেন ও নিউট্রিয়েন্ট পরিবহন করতে পারে না)

•দৃষ্টির সমস্যা (চোখের ছোট ব্লাড ভেসেলগুলো সিকেল সেইপ রক্তের জন্য বন্ধ হয়ে যায় ফলে দৃষ্টি শক্তিতে সমস্যা সৃষ্টি করে এমনকি রেটিনাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে)

রোগ নির্ণয়

মূলত নতুন জন্ম নেওয়া শিশুদের এই টেস্ট এর আওতায় রাখা যেমনটা স্বাভাবিক ভাবেই রক্তের হিমোগ্লোবিন-এর মাত্রা নির্ণয় করে। প্রাথমিক ভাবে রক্তের লোহিত কণিকার সংখ্যার মাত্রা বা হিমোগ্লোবিন এর ধরণের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা করা হয়।

অনেকেই সিকেল সেল জিন এর বাহক হতে পারে তবে তাদের ক্ষেত্রে এই রোগটা প্রকাশ পাবে না তারা স্বাভাবিক থাকবে। যারা বাহক বা যারা ভোক্তভুগী দুইজনের ই দেহে HBS জিনটা থাকবে তবে একজনের কাছে প্রচ্ছন্ন আরেকজনের তা প্রকট। তবে ডাক্তার বা হেলথ কেয়ার স্পেশালিস্ট কয়েকটা পরীক্ষা করেন পুরো সিকেল সেল এনিমিয়াকে নির্ণয় করার জন্য।

•CBC (Complete Blood Count)

• Hemoglobin Electrophoresis (এটি বিভিন্ন হিমোগ্লোবিন এর লেবেল পরিমাণ করার জন্য)

• HPLC - High Performance Liquid Chromatography (হিমোগ্লোবিন এর ভিন্নতা পরিমাপ বুঝতে)

• DNA testing (এই টেস্ট এর ফলে সিকেল সেল এর বাহককে সহজেই নিরুপন করা যাবে)

চিকিৎসা

বর্তমান সময়ে সিকেল সেল এনিমিয়া সম্পূর্ণ সমাধান করা যাবে এমন কোন চিকিৎসার আর্বিভাব হয়নি। তবে স্টেম সেল বা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে এইটার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া জিন থেরাপি দিয়েও বর্তমানে স্বল্প পরিসরে ভালো ফলাফল পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। যেমন CRISPER (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats) প্রযুক্তি দিয়ে ভালো পজেটিভ ফলাফল পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

Hydroxyurea therapy এমন একটি প্রক্রিয়া যা ভ্রুণীয় অবস্থায় হিমোগ্লোবিন এর উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এই প্রক্রিয়া ভালো কাজ দেখিয়েছে। ভ্রুণীয় অবস্থায় সিকেল সেল শনাক্ত করা গেলে বিভিন্ন মেডিকেশন এর মাধ্যমে এর প্রকোপ কমিয়ে আনতে পারবে।

সিকেল সেল-এর বিভিন্ন লক্ষণগুলো থেকে ঠিক থাকতে সঠিক জীবনব্যবস্থা, সঠিক খাবার , ব্যায়াম, ও ডাক্তারের পরামর্শে বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক বা ভ্যাকসিন গ্রহণ করা যাতে কোনো নতুন ইনফেকশন না হয় এই সমস্যা থেকে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গবেষণা

মেডিকেল রিসার্চ সিকেল সেল এনিমিয়ার জন্য আরো উন্নত ও স্থায়ী সমাধান খুঁজে চলেছে নিরাময় এর জন্য। যার ফলে জিন থেরাপি, স্টেম সেল প্রতিস্থাপনের মতন প্রযুক্তির দিকে মনোনিবেশ করেছে আরো উন্নত ফলাফলের জন্য। বর্তমানে খুব ভালো ফলাফল পাচ্ছে ক্লিনিকাল ট্রায়ালের মাধ্যমে এইসব গবেষণা থেকে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বা সামনের কয়েক বছরের মধ্যে এমন কোন স্থায়ী সমাধান পেয়ে যেতে পারি।

সিকেল সেল এনিমিয়া একটি জটিল জেনেটিক ডিসওর্ডার। যার জন্য আজীবন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। যদিও বর্তমানে কোন নিরাময় নেই তারপরেও সেবার অগ্রগতি এই অবস্থার সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে সহায়তা করতে অনেকটা বড় ভূমিকা পালন করছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সিকেলসেল ডিসঅর্ডারের বিস্তার নির্দিষ্ট জনসংখ্যা এবং উপ-অঞ্চলের

মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। মাইগ্রেশন প্যাটার্ন এবং হিস্টোরিকাল জেনেটিক মিশ্রণসহ বিভিন্ন কারণ ও বিভিন্ন অঞ্চলের সিকেল সেল ডিসঅর্ডারের প্রাদুর্ভাবের জন্য ভূমিকা রাখে।

লেখক: মো: আসিফ শাওয়াল
প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, অনার্স ৩য় বর্ষ

আমাদের সাথে যুক্ত হতে আমাদের ফেইসবুক পেইজে যোগাযোগ করুন

www.facebook.com/TachyonTs

মিমস

Collatz Conjecture - গণিতের যে সমস্যার সমাধান হয়নি আজও

Collatz Conjecture বা কোলাজের অনুমান - নামটি শুনতে কঠিন মনে হলেও এর মূল বিষয়টি বোঝা মোটেও কঠিন নয়। গণিতবিদদের কাছে এই সমস্যাটি তাই 'The simple math problem we still can't solve' নামেও পরিচিত। এই সমস্যাটি প্রথম এল কোলাজ 1937 সালে উপস্থাপন করেন।

চলুন, কোলাজের অনুমান -এর অসমাধানকৃত সমস্যা আগে জেনে নিই।
যে-কোনো একটা পূর্ণসংখ্যা নিন। এরপর,
i) সংখ্যাটি জোড় হলে, একে অর্ধেক করুন।
ii) বিজোড় হলে, ৩ দিয়ে গুণ করে সাথে ১ যোগ করুন।
এরপর এই স্টেপগুলো রিপিট করতে থাকুন সেই নতুন সংখ্যাগুলোর উপর।

যদি গণিতের ভাষায় লিখি, একটি সংখ্যা n হলে, যদি n জোড় হয়, তবে n/2 করতে হবে। বিজোড় হলে 3n+1 করতে হবে। এই '3n+1' এর জন্যে এই সমস্যাটিকে অনেক সময় 3n+1 Problem-ও বলা হয়। কোলাজের অনুমান বলে, আপনি যেই সংখ্যা নিয়েই শুরু করুন না কেন, আপনি শেষে গিয়ে একটা লুপে আটকে যাবেন এবং বারবার সেই লুপটাই এরপর চলতে থাকবে। উদাহরণ দিলে বিষয়টা বোঝা যাবে।

আমরা 5 নিয়ে শুরু করলাম। 5 বিজোড় সংখ্যা, তাই আমরা 3*5+1 = 16 নির্ণয় করলাম। এই 16 আবার জোড়, তাই একে 2 দ্বারা ভাগ করে 8 পেলাম। 8-ও জোড়, তাই আমরা একেও 2 দ্বারা ভাগ করে 4 পেলাম। এই 4-ও জোড়, বিধায় একে 2 দ্বারা ভাগ করে 2 পেলাম। 2-ও জোড়, বিধায় একে 2 দ্বারা ভাগ করে 1 পেলাম। 1 বিজোড়, একে 3*1+1 = 4 করলাম। এই 4 জোড়,
বিধায় একে 2 দ্বারা ভাগ করে আবার 1 পেলাম, এবং এই 4 থেকে 2, 2 থেকে 1, এই ধাপগুলোই চলতে থাকবে। অর্থাৎ আমরা একটা লুপে আটকে গেলাম।

আমরা আরও কয়েকটা সংখ্যা নিয়ে কাজ করব। তবে তার আগে 'Orbit'-এর ধারণাটা জেনে নিই। অরবিট হলো সোজা বাংলায় আপনি একটা সংখ্যা নিয়ে সেটার ওপর উপরের দুটোর যেকোনো একটা অপারেশন চালাবেন, নতুন সংখ্যা পাবেন এবং সেগুলোর উপরও অপারেশনগুলো চালাতে থাকবেন। এভাবে সংখ্যাগুলোর যে ধারা পাবেন, সেটাই আপনার 'অরবিট'। তো আমরা যে 5 সংখ্যাটা নিয়ে শুরু করেছিলাম, সেটার অরবিট হবে এমনঃ 5→16→8→4→2→1→4... ...

চলুন, আমরা আরেকটা সংখ্যা 21 নিই। তাহলে 21-এর অরবিট হবে এমন:
21→64→32→16→8→4→2→1→4... ...

খেয়াল করেছেন, আমরা প্রতিবারই 4→2→1→4 লুপে আটকে যাচ্ছি। কোলাজের অনুমান এই কথাটিই বলে যে, আপনি যে সংখ্যা দিয়েই শুরু করুন না কেন, আপনি এই লুপটাতেই বারবার আটকে যাবেন। মজার বিষয় হচ্ছে, এই কথাটি আজও সকল সংখ্যার জন্য সত্য প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এমন কোনো সংখ্যাও পাওয়া যায়নি, যেটা এই লুপের বাইরে যেতে পারে। গণিতের

ভাষায় এইরকম বিষয়গুলোকেই অনুমান বলা হয়, এমন একটা স্টেটমেন্ট যেটার প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবুও সেটাকে সত্য বলে ধরা হয়। কোলাজের অনুমান এরকমই একটি বিখ্যাত অনুমান।

এখন পর্যন্ত গণিতবিদেরা 268 পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে কাজ করেছেন। প্রতিক্ষেত্রেই সংখ্যাগুলো 4,2,1,4,... ... লুপে আটকে গিয়েছে। 268 সংখ্যাটি 300 কুইনট্রিলিয়ন-এর কাছাকাছি। 1 কুইনট্রিলিয়ন হলো আপনি যদি ১ এর পর ১৮টা শূন্য বসান, সেই সংখ্যাটা। তাহলে চিন্তা করুন, এতগুলো সংখ্যা নিয়ে কাজ করা হয়েছে এবং এই স্টেটমেন্ট-এর ব্যতিক্রম পাওয়া যায়নি। কিন্তু যেহেতু সকল সংখ্যার জন্যেও প্রমাণ করা যায়নি, তাই এটি এখনো একটা অনুমান কেবল।

এই মজার সমস্যাটি নিয়ে যুগে যুগে অনেক চ্যালেঞ্জ আর প্রাইজ মানি ছোড়া হয়েছে। থোয়াইটস (1996) ১০০০ ইউরোর পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন যদি কেউ এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারে, তার জন্য। জাপানের বাকুয়েজ কোম্পানি লিমিটেড ১২০ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন ঘোষণা করেছে যদি কেউ এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারে। মজার এই সমস্যাটি প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময় ধরে গণিতবিদদের ভাবিয়েছে, এখনো ভাবাচ্ছে। সমস্যাটির অনেক সমাধান প্রস্তাবিত হলেও এর কোনো বিশ্বাসযোগ্য সমাধান এখনো আসেনি।

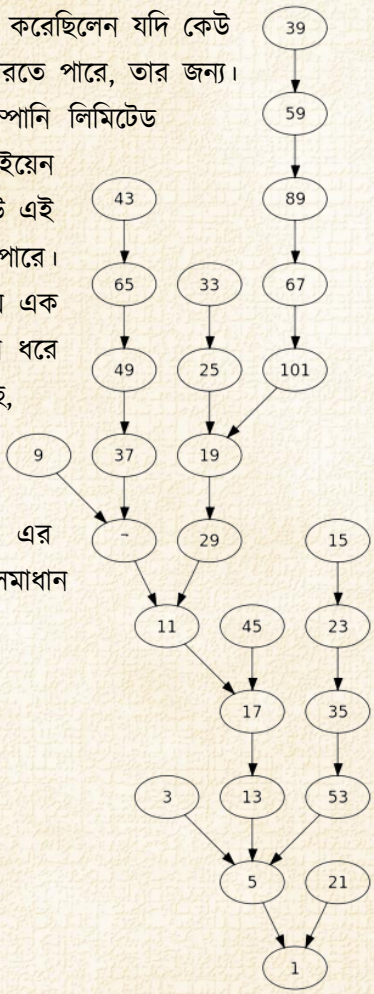

লেখক -
আজরাফ খান জারিফ
ঢাকা কলেজ, দ্বাদশ শ্রেণী

বিয়ন্ড দ্য মিথ: আনারস এবং দুধের কথিত প্রাণঘাতী জুটির পিছনে সত্যের সন্ধান

অনেকে বলে কৌতূহল বিড়ালকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু একটি নিরীহ আনারস-দুধের জুটি কি সত্যিই মানুষের জন্য মারাত্মক হতে পারে? কল্পকাহিনী থেকে সত্যকে আলাদা করার এবং এই ব্যাপকভাবে বিতর্কিত এই গুজবের উৎস অন্বেষণ করার সময় এখন এসে গেছে। গুজব খন্ডনের যাত্রায় ডুব দেওয়ার আগে এই দুধ-আনারস গল্পের মূল খেলোয়াড়দের পরিচয় জানার জন্য একটু সময় নিই। আনারস একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল, যা তার মিষ্টি এবং টক স্বাদের জন্য পরিচিত। ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং এনজাইম দিয়ে পরিপূর্ণ যা স্বাস্থ্যকর খাবার। এতে ভিটামিন এ এবং সি থাকে। অন্যদিকে, দুধ বিশ্বব্যাপী প্রচলিত খাদ্য উপাদান, যা ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। দুধকে বলা হয় আদর্শ খাবার। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুধই একমাত্র তরল জাতীয় খাবার যেখানে প্রায় সব ধরনের পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। প্রোটিন, ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেটের দারুণ এক মজাদার মিক্সচার হলো দুধ। তাই সব বয়সী বাচ্চাদের পাশাপাশি পূর্ন বয়স্ক লোকদের জন্য ও দুধ একটি উপাদেয় খাদ্য। ডাক্তার ইউলিয়াম ওলসারের মতে, "দুধ একটা আদর্শ খাবার। এটা আপনাকে সবই দেবে শক্তিশালী ও সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য"

একটা গল্প অনুসারে, আনারস এবং দুধ একসাথে খেলে পাকস্থলীতে মারাত্মক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে পারে, যার ফলে বদহজম হতে পারে এবং চরম ক্ষেত্রে মৃত্যুও হতে পারে। এই বিশ্বাসটি অনেকের মধ্যে ভয় এবং সংশয় সৃষ্টি করেছে। আমাদের দাদা-দাদী কিংবা নানা-নানীদের বলতে শুনেছি যে দুধ খেয়ে আনারস খাওয়া যাবে না কিংবা আনারস খেয়ে দুগ্ধজাত খাবার খাওয়া যাবে না। তাতে নাকি অকালেই পটল তুলবে। হা হা হা...! আসলেই এগুলো আদৌ সত্যি নয়। আচ্ছা তাহলে সত্য উদঘাটনের জন্য বিজ্ঞানের দিকে ফিরে যাই।

যদিও এটা সত্য যে আনারসে ব্রোমেলাইন নামক একটি এনজাইম রয়েছে। ব্রোমেলাইন প্রোটিন ভাঙতে সাহায্য করে। অন্যদিকে দুধে প্রোটিন থাকে। এই ধারণাটি, যে এই দুটি উপাদান মিলিত হলে বিষাক্ত সংমিশ্রণে পরিণত হয়, তা সঠিক নয়। আনারসের ব্রোমেলেন দুধের প্রোটিনের সাথে ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া দেখায় এই ধারণার স্বপক্ষে কোনো গবেষণায় কোনো প্রমাণ দেখা যায়নি।

আনারসে প্রচুর ফাইবার বা আঁশ থাকে। এ কারণে আনারস খেলে অনেকের অ্যাসিডিটির সমস্যা দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে অনেকেই দুধ হজম করতে পারেন না। ফলে বদহজম বা পেট খারাপ দেখা দেয়। দুধে ল্যাকটোজেন থাকে। তোমাদের মধ্যে অনেকের পেটেই এই ল্যাকটোজেন সহ্য হয় না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের

ভাষায় একে, 'Lactogen Intolerance' বলা হয়। তবে বেশিরভাগ মানুষেরই দুধ হজম করতে কোনো সমস্যা হয় না।

তদুপরি, আমাদের পাচনতন্ত্র দ্বারা বিভিন্ন ধরণের খাদ্যের সংমিশ্রণ সহজেই হজম হয়। আমরা যে খাবারই খাই না কেন, পাকস্থলীর অ্যাসিড এবং হজমকারী অ্যানজাইমগুলি পুষ্টির ভাঙ্গন এবং শোষণের জন্য একসাথে কাজ করে। দেহের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলি নিশ্চিত করে যে আমরা যেকোনো খাবার খাই তা নিরাপদে এবং কার্যকরভাবে হজম হয়।

তাহলে মৃত্যুর ভুল ধারণাটি কীভাবে এল? এর পিছনে একটি লোক কাহিনি প্রচলিত আছে। আনারস সাধারণত ঝোপঝাড়ের মধ্যেই হয়। আর ঝোপ মানেই সাপের মিলনমেলা। প্রচলিত আছে একবার এক বিষধর সাপ আনারসের ঝোপে ঘাপটি মেরে ছিল। কোনোভাবে সেই সাপ আনারসের গায়ে বিষ ঢেলে দিয়েছিল। এরপর সেই বিষাক্ত আনারস খেয়ে ফেলেন এক ব্যক্তি। এর পরপরই চুমুক দেন দুধের গ্লাসে। ব্যস, খানিক পরেই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে আমাদেরকে রেখে বিদায় নেন। ফলে লোকজন ধরে নেয়, আনারসের পর দুধ পান করায় তিনি প্রাণ খুইয়েছেন এবং তারপর থেকেই ছড়িয়ে পড়ে সেই কুসংস্কার। (আগের মানুষ কত বোকা ছিল তাই না?)

সুতরাং বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং আমাদের পরিপাকতন্ত্রের গভীর উপলব্ধির মাধ্যমে, আমরা আনারস এবং দুধের মারাত্মক সংমিশ্রণকে ঘিরে থাকা মিথকে আত্মবিশ্বাসের সাথে উড়িয়ে দিতে পারি।

লেখক: মুনেম শাহরিয়ার

একটু শুনুন

বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাদের মাঝে মাঝেই আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয়। আপনাদের হতে প্রাপ্ত অনুদানে আমরা কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হই! এজন্য আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমাদের সকল আয়-ব্যায়ের খতিয়ান আমাদের ওয়েবসাইটের সাপোর্ট পেইজে পাবেন! আমাদের অনুদানের ঠিকানা-

https://tachyonts.com/

গণিত কুইজ ০১

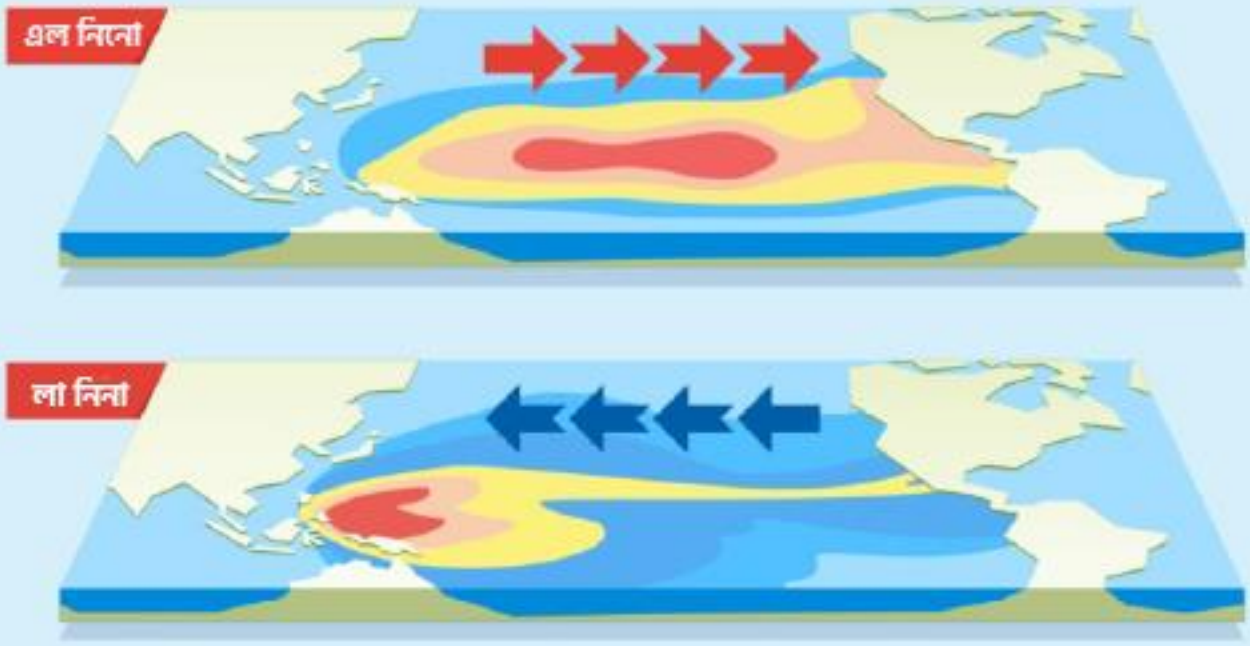

এল-নিনো এবং লা-নিনা

এল-নিনো এবং লা-নিনা,, শব্দগুলো শুনতে ভৌতিক ও রহস্যময় লাগতে পারে। এল-নিনো (El Nino) আর লা-নিনা (La Nina) হলো স্প্যানিশ শব্দ। এর অর্থ হলো 'ছোট্ট ছেলে' (the little boy) অন্যটির অর্থ হলো 'ছোট্ট মেয়ে' (the little girl)। লা-নিনাকে কোন কোন সময় El Viejo,anti-El Niño বলা হয়ে থাকে।

এই ছোট্ট ছেলে-মেয়ে দুটি দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের বাসিন্দা। আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ১০০ বছর আগে, পেরুর জেলেদের চোখে প্রথম ধরা পড়ে ওরা। সেই থেকেই এই নামকরণ। বিষয়টির সাথে সমুদ্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমুদ্র কার না ভালো লাগে! কিন্তু আগে সমুদ্রকে জানতে হলে সমুদ্রের গতিপ্রকৃতির সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল অর্থাৎ সাগরের সাথে সামগ্রিক আবহাওয়ার পরিবর্তনগুলো জানা জরুরি।

এল-নিনো এবং লা-নিনা হলো সামুদ্রিক-বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালনের (ocean-atmospheric circulation) ফলাফল। এদেরকে মূলত চিহ্নিত করা হয় সমুদ্রপৃষ্ঠের বিশাল বিস্তৃতি জুড়ে একটি জলবায়ুর প্রভাব নিয়ে। এটা উষ্ণ এবং ঠান্ডা পানির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম মিথস্ক্রিয়া, যা গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় থেকে শুরু করে বৈশ্বিক তাপমাত্রার ওঠানামা পর্যন্ত সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। সকলকে এই এল-নিনো এবং লা-নিনা রাজ্যে স্বাগতম।

কল্পনা করি যে, একটি বাথটাব পানিতে পূর্ণ আছে। বাথটাবের পানি সাধারণত স্থির তাপমাত্রায় থাকে। যাইহোক, কখনও কখনও বাথটাবের পানি স্বাভাবিকের চেয়ে গরম বা ঠান্ডা হতে পারে। একে তাপমাত্রার অসঙ্গতি বলা হয়। এল-নিনো এবং লা-নিনার কাহিনী ও একই, তাপমাত্রার অসঙ্গতি। এল-নিনো হলো একটি জলবায়ু প্যাটার্ন, যার কারণে গ্রীষ্মমন্ডলীয় প্রশান্ত মহাসাগরের পানি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গরম হয়ে যায়। এই উষ্ণ পানি সারা বিশ্বের আবহাওয়ার ধরণে পরিবর্তন আনতে পারে। উদাহরণ, এল-নিনোর কারণে অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় খরা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বন্যা হতে পারে।

লা-নিনা হল এল-নিনোর বিপরীত। লা-নিনা গ্রীষ্মমন্ডলীয় প্রশান্ত মহাসাগরের পানিকে স্বাভাবিকের চেয়ে শীতল করে তোলে। এই শীতল পানি গোটা বিশ্বের আবহাওয়ার ধরণেও পরিবর্তন আনতে পারে। উদাহরণ, লা-নিনা দক্ষিণ-পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোতে খরা এবং অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় বন্যার কারণ হতে পারে।

কিছুটা একটু গোলমেলে লাগতে পারে বিষয়টা। চলুন আরেকটা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি!
কল্পনা করি, যে এমন একটি দেশে বাস করি আমরা, যেখানের আবহাওয়া সাধারণত উষ্ণ এবং আর্দ্র থাকে। এল-নিনোর সময় আবহাওয়া স্বাভাবিকের চেয়ে শুষ্ক এবং গরম হতে পারে। যার ফলে পরিবেশ একটি মরুভূমিতে বসবাসের মতো হতে পারে! গাছপালা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পানি করবে। কারণ তখন আবহাওয়া অনেকটা বেশি উষ্ণ হবে।

আবার ধরি আমরা এমন একটি দেশে বাস করি, যেখানে আবহাওয়া সাধারণত শুষ্ক এবং গরম থাকে। লা-নিনার সময়, আবহাওয়া স্বাভাবিকের চেয়ে আর্দ্র এবং শীতল হতে পারে। যা একটা রেইনফরেস্টে বসবাসের মতো হতে পারে! হতে পারে প্রায়শই রেইন গিয়ার পরতে হতে পারে তুমি হাইকিং এ যেতে পারবে না। কারণ আদ্রতা বেশি যার ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় তোমাকে বেশি ঘামাবে!
এল-নিনো ও লা-নিনার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখলে বিষয়টি তোমার কাছে আরো পরিষ্কার হবে। পার্থক্যগুলো হলো:

সমুদ্র জলের উষ্ণতা

এল-নিনো হলো এক প্রকার উষ্ণ স্রোত।
লা-নিনা এক প্রকার শীতল সমুদ্র স্রোত।

প্রবাহের দিক

এল-নিনো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়।
লা-নিনা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।

বায়ুর চাপ

এল-নিনোর প্রভাবে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে নিম্ন চাপ ও পশ্চিম উপকূলে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়।
লা-নিনার প্রভাবে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে উচ্চ চাপ ও পশ্চিম উপকূলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

আয়ন বায়ুর প্রবাহ

এল-নিনোর সময় আয়ন বায়ু প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

এল নিনো

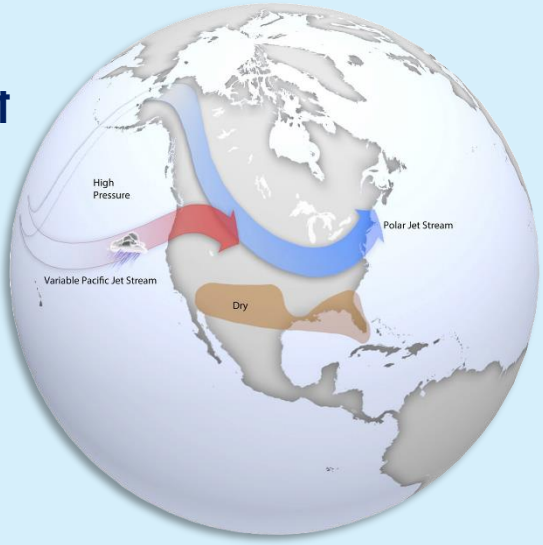

লা নিনা

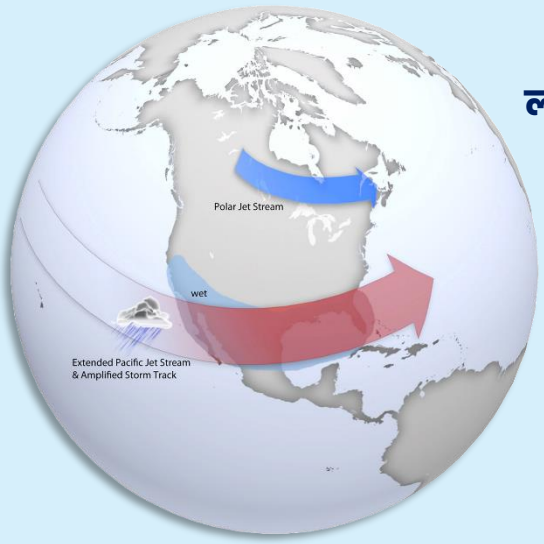

লা-নিনার সময় আয়ন বায়ু প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

আবহাওয়া

এল-নিনোর প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে ও বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ও পশ্চিম উপকূলে খরার প্রাদুর্ভাব ঘটে।

লা-নিনার প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে ও পূর্ব উপকূলে শুষ্ক পরিস্থিতির বিকাশ ঘটে।

এল-নিনো (El Nino) প্রতি ৩ থেকে ৮ বছর পর পর দেখা যায়। তা বিরাজমান থাকে প্রায় ১ বছর কখনো কখনো দেড় বছর পর্যন্ত। এই সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রায় বিস্তর পার্থক্য হয় (প্রায় ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তখন এটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা এবং মাঝেমধ্যে পুরো পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবান্বিত করে। ভারত মহাসাগর, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার ভূপৃষ্ঠের চাপ বেড়ে যায়। তাহিতি ও প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বে বায়ুমণ্ডলের চাপ বেড়ে যায়। পেরুর নিকটে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়ে। এবং পেরুর উত্তরে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়ায়। পূর্বের উষ্ণ সাগরের পানি পশ্চিমে চলে আসে এবং সেখানের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ৩০ সেন্টিমিটারেরও বেশি বেড়ে যায়। পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে খরা দেখা দেয়। সব থেকে বড় কথা এল-নিনোর প্রভাবে জলজ প্রাণির জীবন ধারণের জন্য পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে না এবং পেরুর সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় মৎসপ্রজাতি পাওয়া যায় না। ফলে জেলেরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

আবার লা-নিনাতে, পেরু এবং চিলির পূর্ব উপকূলে মৎসপ্রজাতি বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়। কারণ, সেখানে সমুদ্রের তাপমাত্রা জলজ প্রাণীর জীবনধারণের অনুকূলে থাকে। (যেহেতু এল-নিনো না-লিনার বিপরীত!)

এল-নিনো ও লা-নিনা বর্ষ-

আঠারোশো শতকে মাঝারি ধরনের সব মিলিয়ে ৩২টি এল-নিনো শনাক্ত করা হয়েছে। গত ৫০ বছরে এল-নিনো হয়েছিল ৬৩-৬৪, ৬৫-৬৬, ৬৯-৭০, ৭২-৭৩, ৭৬-৭৭, ৭৭-৭৮, ৮২-৮৩, ৮৬-৮৭, ৯১-৯২, ৯২-৯৩, ৯৪-৯৫, ৯৭-৯৮, ২০০২-০৩, ০৪-০৫, ০৬-০৭ এবং ২০০৯ সালে। সবশেষ এল-নিনো ঘটে ২০০৯ জুন থেকে শুরু করে ২০১০'র মে মাস অবধি (equatorial pacific ocean)

অন্যদিকে লা-নিনা হয়েছিল ৬৪-৬৫, ৭০-৭১, ৭৩-৭৪, ৭৫-৭৬, ৮৮-৮৯, ৯৫-৯৬, ৯৮-৯৯, ২০০০-২০০১ ও ২০০৬ সাল এবং ২০১০ সালের শেষ থেকে এখন পর্যন্ত চলছে। এর আগের ৫০ বছরের এল-নিনো হয়েছিল ১৪ বার এবং লা-নিনা হয়েছিল ১২ বার। এছাড়া ১৯৪০-১৯৪১, ১৯৫৭-১৯৫৮ এবং ১৯৭২-১৯৭৩ সালের এল নিনোকে শক্তিশালী এবং ১৮৯১, ১৯২৫-১৯২৬ ও ১৯৮২-১৯৮৩ সালের ঘটনাসমূহকে খুবই শক্তিশালী ধরা হয়। জলবায়ু বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে এ ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং এল-নিনো - দুটি ঘটনাই পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এল-নিনোকে প্রভাবিত করতে পারে-যদিও এখন পর্যন্ত এটি একটি হাইপোথিসিস মাত্র। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এল-নিনো এবং লা-নিনা কোনো কারণ প্রমাণসহ আবিষ্কার করতে পারেননি। কিছু বিজ্ঞানীর মতে, গত ২৫ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, বৈশ্বিক

উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে আরও শক্তিশালী এল-নিনোর উদ্ভব হবে।

তাহলে বাংলাদেশ ও কি এই এল-নিনো এবং লা-নিনার ঝুঁকিতে আছে?

উত্তর হচ্ছে হ্যা! পূর্বাভাস অনুযায়ী এল-নিনো জলবায়ু পরিস্থিতি শুরু হয়ে গেছে। এতে আবহাওয়া ও তাপমাত্রা চরম রূপ ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সাল বেশি উষ্ণ হবে। তোমরা ইতিমধ্যে তা লক্ষ্য করেছো। বাংলাদেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধি তার প্রমাণ। যা ২০২৪ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৯ শতকের শেষ দিকে এই পৃথিবী যতটা উষ্ণ ছিল তার তুলনায় ২০২২ সালে পৃথিবীর তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১.১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি। সেই ধারাবাহিকতা ২০২৩ ও ২০২৪ সালেও অব্যাহত থাকবে বলে সতর্ক করেন বিজ্ঞানীরা।

এল-নিনো এবং লা-নিনা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। তবে তুমি আমি চাইলেই এর প্রভাব কিছুটা হলেও কমাতে পারি। বেশি বেশি গাছ লাগতে হবে আমাদের। তাতে একটু হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব আমরা।

লেখকঃ মুনেম শাহরিয়ার,

আমার বেশ পছন্দের একটা প্রবাদ দিয়ে শুরু করি।

"There are no unmixed blessings on Earth."

সোজা বাংলা করলে দাঁড়ায় , "পৃথিবীতে প্রত্যেকটা কিছুরই একটা ভালো এবং খারাপ দিকে আছে।" ঘটনার সূত্রপাত, যখন টিম-বার্নাস লি নামে এক ভদ্রলোক প্রথমবারের ইন্টারনেট আবিষ্কার করেন এবং সেটাই ওয়েব ১.০ ছিল। ১৯৯১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত রাজত্ব কায়েম করে রাখা এই ওয়েবে তখন মানুষ আসতো 'কনজিউম' করার জন্য। অর্থাৎ ওই সময় মানুষ আসতো, ইন্টারনেট থেকে আর্টিকেল পড়ে চলে যেতো। এজন্য যারা সেইসময় অনলাইনে আসতো তাদের 'ইউজার' না বলে 'ক'-ই বলা হতো বেশিরভাগ সময়। সেই সময় 'Interact' করা অর্থাৎ, রিয়েক্ট/কমেন্ট করার কোন সুযোগ ছিল না। আর এই সমস্যা সমাধানে আবির্ভাব হয় Web 2.0-এর।

Web 2.0:

২০০৪ সালে 1.0 কে গদি থেকে সরিয়ে সিংহাসন দখল করে এবং এখনও সে গদিতেই আছে। আমরা বর্তমানে যেই ওয়েব ব্যবহার করি সেটাই Web 2.0। এর সবচেয়ে বড় সংযোজন হিসেবে আসলো কমেন্ট/রিয়েক্ট করা তথা ইনটারেক্ট করার সুবিধা। আর এই সুবিধা ব্যবহার করে আজকের দিনে মিলিয়ন ডলারের সোশাল মিডিয়া যেমন: ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ আর ভিডিও স্ট্রিমিং সাইট যেমন: ইউটিউব ইত্যাদি এসেছে এবং আসছে।

বেশ চমৎকারই চলছিল দিনকাল। কিন্তু প্রথমেই বলা প্রবাদের সফল প্রয়োগ Web 2.0 এও দেখা যায়। Web 2.0 এ অসংখ্য ঝামেলার মধ্যে অন্যতম হলো:- Centralisation ও No Privacy।

নো প্রাইভেসি সহজ বিষয়। মানে আজকের দিনে আপনি কী করছেন সব তথ্য ফেসবুকের কাছে আছে। ফেসবুকের কাছে আপনার মোবাইলের স্টোরেজ, স্পিকার, সেল্ফি ক্যামেরা, ব্যাক ক্যামেরা, লোকেশন সবকিছুর এক্সসেস আছে। আপনি কোন পোস্ট কতক্ষণ, কোথায়, কীভাবে পড়ছেন, পড়ে আপনি কী কমেন্ট করছেন, কী রিয়েক্ট দিচ্ছেন, কী সার্চ করছেন, কেন সার্চ করছেন এমন হাবিজাবি সব তথ্য তাদের কাছে আছে। এই তথ্য তারা বিভিন্ন কোম্পানির কাছে বেঁচে আর কোম্পানি সেই তথ্য ব্যবহার করে আপনাকে টার্গেট করে এড বানিয়ে আপনাকেই তাদের প্রোডাক্ট বেঁচে। যে কোম্পানির নাম আপনি জীবনে শোনেননি তাদের কাছেই আপনার বায়োডাটা আছে। বিশ্বাস না হলে এই পোস্ট পড়ার পর গিয়ে আপনি কেনা যায় এমন কিছু একটা ফেসবুকে সার্চ দেন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনি ওই প্রোডাক্ট রিলেটেড এড দেখবেন। শোনা যায়, এজন্য স্বয়ং মার্ক জাকারবার্গ নাকি ল্যাপটপ চালানোর সময় ক্যামেরার উপর ট্যাপ লাগিয়ে রাখেন! এখন আপনি যদি এইসব শুনে ফেসবুক/গুগলের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সিদ্ধান্ত পাল্টান। কারণ, আপনার ডাটা নেওয়ার অনুমতি আপনি নিজেই দিয়েছেন। মনে পড়ে? এপ চালু করার সময় আপনার সামনে একটা বিশাল লিস্ট এসেছিলো যেটা না পড়েই আপনি 'I agree' তে ক্লিক করে দিয়েছিলেন। এরপর প্রতি পদে পদে

পারমিশন দিয়েছিলেন। ওইগুলোই ছিল ওদের অনুমতি দেওয়া। সম্প্রতি আইফোন তাদের অপরেটিং সিস্টেম IOS এর ভার্সন 14.5 এ একটা ফিচার লঞ্চ করেছে। ওই ফিচার অন/অফ করার মাধ্যমে আপনি কোন এপ আপনাকে ট্র্যাক করতে পারবে কিনা সেটার অনুমতি দিতে/নিয়ে ফেলতে পারবেন। ধারণা করা হচ্ছে এই এক ফিচারের জন্য ফেসবুকের নাকি ১০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হতে পারে! অন্যদিকে গুগল পৃথিবীর মোট সার্চের ৮৭% কন্ট্রোল করে! ৮৭%! মানে জনপ্রতি প্রতি ১০০টা সার্চের ৮৭টা। সবকিছুর সারমর্ম হলো, পুরো ইন্টারনেটকে নিজের কব্জায় রেখে চালাচ্ছে ফেসবুক/গুগলের মত ২/৩টা বড় বড় কোম্পানি। তো এই যে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর সমস্তকিছু সেই গোষ্ঠীর কিছু হাতে-গোণা কয়েকজন মানুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কন্সেপ্টটাকে বলে 'Centralization'। এই Centralization আর এই Centralization-এর ফলে তৈরি হওয়া 'নিজের গোপনীয়তার আর গোপন না থাকার সমস্যা' বা No Privacy Problem এই দুইটা বড় এবং ভয়ানক কারণই হলো Web 3.0 এর উদ্ভবের মূলে।

অর্থাৎ, Web 3.0 হলো আমাদের বর্তমান ইন্টারনেট বা Web Web 2.0 এর আপডেটেড ভার্সন যার বিশেষত্ব বা সবচেয়ে চমকপ্রদ ফিচার হচ্ছে 'DOB'। DOB অর্থ: Decentralised Open-Source Secured by Blockchain

Decentralized কথাটি Centralized-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের Web 2.0-এর সব ক্ষমতা ১/২টা বড় কোম্পানির হাতেই চলে গিয়েছে প্রায়। Web 3.0 এ এই বিষয়টি থাকবেই না। এই ওয়েবে পুরো ইন্টারনেটের মালিকানা পুরো বিশ্ববাসীর মাঝে ভাগ করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ওপেন সোর্স মানে হচ্ছে যেহেতু আপনি ইন্টারনেটের মালিকানা পেয়ে যাবেন, আপনি চাইলে এই ইন্টারনেট নিজের মত কাস্টমাইজও করতে পারবেন! এবং সিকিউরড বাই ব্লকচেইন মানে এখানের সব তথ্য ব্লকচেইনের এর সাহায্যে সুরক্ষিত থাকবে এবং আপনার Data নিয়ে কেউ ব্যবসা করতে পারবে না।

এই Web 3.0-এর আইডিয়া সবার আগে আসছিলো Dr. Gavin Wood নামে এক ব্যাক্তির মাথায় যে ইথেরিয়াম নামে একটা ক্রিপ্টোকারেন্সির কো-ফাউন্ডার। তিনি পুরো পৃথিবীকে 'Web 3.0' এই কন্সেপ্টের সাথে পরিচয় করান। ইথেরিয়াম পৃথিবীর জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত ক্রিপ্টোকারন্সিগুলোর মধ্যে একটি।

Web 3.0-এর সবচেয়ে বড় ৫ টা সুবিধা:

Anonymous Single Sign On: অর্থাৎ, আপনি কোথাও একবার Sign Up করে একটা একাউন্ট তৈরি করলেই হবে। সারাজীবনে আর পুরো ইন্টারনেটের কোথাও Sign In করা লাগবে না আর আপনার ইউজার ডিটেইলস থাকবে একদম সিকিউরড।

Self Governing: অর্থাৎ, এখন কোন ওয়েবসাইট তার ইউজারদের জন্য নিয়ম তৈরি করে। Web 3.0 এসে গেলে ইউজাররা নিজেরা মিলে ওয়েবসাইটের জন্য নিয়ম বানাতে পারবে।

Better Search: আজকের দিনে আপনি যখন কোন কিছু খুঁজেন তখন আপনাকে অনেক নির্দিষ্ট হতে হয়। অর্থাৎ, কোন গান শুনতে আপনাকে গানের নাম লিখে সার্চ করতে হবে। কিন্তু আমি Web 3.0 তে এভাবে সার্চ করতে হবে না। কারণ তখন সার্চকে আর ইউজার ফ্রেন্ডলি বানাতে হবে।

Personalized Browsing Experience: আজকের দিনে আপনি যখন কোন ওয়েব খুলেন, এটা সবার জন্য একইরকম খুলে এবং ওয়েবের মালিক যেরকম বানিয়েছে সেরকমই খুলে। কিন্তু Web 3.0 আসলে আপনার জন্য কোন ওয়েবসাইটের ডিজাইন কেমন হবে সেটা আপনি ঠিক করতে পারবেন।

Uninterrupted Service: মানে সহজ কথায়, Web 3.0-এর কোন সার্ভিস এর সার্ভার কখনই ডাউন হবে না। যেটা প্রত্যেক রেজাল্টের সময় শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইট হয়ে যায়।

ধারণা করা হচ্ছে এই সব সুবিধার সর্বোচ্চ পরিমাণ এক্সেস পাওয়া যাবে Metaverse এ।

তবে সবকিছু ছাড়িয়ে এর সবচেয়ে সেরা ফিচার হলো: "আপনি Web 3.0 তে এড দেখার জন্যও টাকা পাবেন"। মানে এতদিন কি হতো? আপনি ধরেন ইউটিউবে একটা এড দেখতেন এর বিনিময়ে যার ভিডিওতে এড ছিল সেই ইউটিউবার আর ইউটিউব কামাতো। আপনি কিছুই পেতেন না। কিন্তু, Web 3.0 তে আপনি এই এড দেখার জন্যও টাকা পাবেন।

তো Web 3.0 এর এত্তো গুণকীর্তন গাওয়ার পর আপনার মনে হতেই পারে যে এত্তো ভালো প্রযুক্তি এখনো আসে নাই কেন? তাই এখন মূলত আলোচনা হবে যে Web 3.0 আসলো না কেন বা Web 3.0 এর সবচেয়ে বড় ৫টা অপকারীতা।

মূলত অসুবিধার কথাগুলো সবার আগে বলেন Jack Dorsey যিনি টুইটারের Founder ওরফে Ex CEO। তার মতে, ইন্টারনেটকে Decentralised করা যাবে না। এটার একটা মালিক থাকা লাগবেই। না হলে অনেক সমস্যা দেখা দিবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা দেখা দিবে সেটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বা নজরদারির অভাবে সাইবার ক্রাইম অনেক বেশি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে! আর এই সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ করতে প্রায় হিমশিম খেতে হবে। পরের যে সমস্যা দেখা দেবে সেটা হলো Force Update সমস্যা। মানে Web 3.0 এ প্রচুর রিসোর্স আর ফিচার লোডেড। তাই Web 3.0 এক্সসেস করতে হলে সবগুলো পুরোনো হার্ডওয়্যারকে এবং সব বিজনেসকেও জোরজবরদস্তি আপডেট করতেই হবে। হার্ডওয়্যার আপডেটের লোড নিতে পারলে তো ভালো।

নাহলে.....। শেষে যে বড় ধরণের সমস্যা আসে, এটা অনেক বেশি কনফিউজিং। দেখেন, Web 3.0 পূর্ণভাবে Blockchain দিয়ে সিকিউরড থাকবে। আবার ব্লকচেইন এবং Web 3.0 দুইটাই Decentralised-এর ভিত্তি করে তৈরি করে। আমরা জানি, Decentralisation-এর উপর ভিত্তি করে বানানো সবকিছুর মালিকানা Distributed মানে সবার মাঝে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেওয়া। তার মানে আপনার কাছে ইন্টারনেটের মালিকানা আছে তার মানে আপনার কাছে ইন্টারনেটের এক্সসেসের সুবিধাও আছে। তার মানে হয়তোবা Web 3.0 ব্যবহার করে যে কেউ ইন্টারনেটে থাকা যে কারো Public এবং Private ডাটা এক্সসেস নিতে পারবে। এদিকে Web 3.0 আসার মূল কারণগুলোর মধ্যে একটা হলো, No Privacy Problem সলভ করা।(না বুঝলে ঠান্ডা মাথায় আবার পড়েন।) কি আজব সমস্যা না? অনেকটা এরকম:
“আমি সবসময় মিথ্যা কথা বলি”

তবে এই সম্পূর্ন বিষয়টা এখনো হাইপোথিসিস আকারে আছে। Metaverse এ Web 3.0 ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা রয়েছে। যাতে আরো ৫-১০ বছরের মত সময় আছে।

লেখক: তারুণ্য

বিজ্ঞানীদের গল্প

01

১৯২১ সালের ৩রা ডিসেম্বর:
গ্যালিলিও গ্যালিলি প্রথম দূরবর্তী টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন।

02

১৯৬৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর :
ডাক্তার ক্রিস্টিয়ান বার্নাড ২০ জন সার্জন ডাক্তারের একটি দলসহ সর্বপ্রথম হার্ট ট্রান্সফার করেন।

03

১৮৮৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর :
টমাস আলভা এডিসন সর্বপ্রথম তার নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে রেকর্ডকৃত এক লাইনের মানব কণ্ঠস্বর প্রদর্শন করেন যা ছিল,
"Marry had a little lamb".

04

১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর:
আলফ্রেড নোবেল মৃত্যুবরণ করেন। এরপর থেকেই এই দিনে নোবেল পুরষ্কার অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

05

২১শে ডিসেম্বর:

এইদিনই প্রথমবারের মতো মেরি কুরি এবং তার স্বামী বিজ্ঞানী পিয়েরে কুরি রেডিয়াম-ক্লোরাইডকে ইউরেনিয়ামের আকরিক থেকে আলাদা করতে সক্ষম হোন। যদিও এটায় তাদের জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছিল।

06

১৯৯৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর:

এডউইন আর্মস্ট্রংকে 2 path FM radio এর জন্য পেটেন্ট প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এডউইন আর্মস্ট্রং হলেন একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার এবং উদ্ভাবক যিনি এফএম রেডিও ডেভেলপ করেন।

07

২০২১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর:

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপকে মহাকাশের পথে পাড়ি জমায়। জোতির্বিদ্যা ও কসমোলজিতে যা এখন বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

08

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর:

দূরবর্তী সুপারনোভা নিয়ে গবেষণার সময় গবেষকরা ডার্ক এনার্জির অস্তিত্ব নিশ্চিত করেন। এটি এক প্রকার রহস্যময় শক্তি যা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করে

09

২০১৭ সালের ডিসেম্বর:

চীনা বিজ্ঞানীরা দেহ কোষের নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার কৌশল ব্যবহার করে দুটি অভিন্ন লম্বা-লেজযুক্ত ম্যাকাক বানরের সফল ক্লোনিং রিপোর্ট করেছেন, যা ক্লোনিং প্রযুক্তিতে অগ্রগতি এনেছে।

10

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর:

ফ্রান্সের পাস্তুর ইনস্টিটিউটের গবেষক লুক মন্টাগনিয়ার এবং ফ্রাঙ্কোয়েস ব্যারি-সিনৌসি হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এইচআইভি) শনাক্ত করেন, যা এইডস সৃষ্টির জন্য দায়ী।

নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়

বিশাল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হাজারো কোটি অগণিত গ্রহ নক্ষত্র। আমাদের দৃশ্যমান (Observable) এই মহাবিশ্বে (যার ব্যাস ৯৩.০১৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ) রয়েছে প্রায় ২ ট্রিলিয়ন নক্ষত্র। যেখানে শুধু আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে রয়েছে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন নক্ষত্র। অনেক সময়ই টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া, খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবী থেকে অমুক নক্ষত্রের দূরত্ব এত কোটি আলোকবর্ষ। কখনও কি মনে হয়েছে বিজ্ঞানীরা এত এত নক্ষত্র কিংবা এত দূরের নক্ষত্রের দূরত্ব কীভাবে পরিমাপ করেন? এটা নিয়ে জানার চেষ্টা করা যাক এবার।

Parallax Method:

নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপের জন্য বিজ্ঞানীরা নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। প্রাচীন গ্রীসে ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে উদ্ভাবিত প্যারালাক্স (Parallax) পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বপ্রথম পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করা হয়েছিল। এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে প্যারালাক্স আবার কী? চলো একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাই।

ধরো তুমি একটা দেয়াল হতে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি ও দেওয়ালের মাঝে দড়ি দিয়ে ঝুলানো একটা ছোট কোনো বল বা বস্তু আছে। তুমি এক চোখ বন্ধ করে বস্তুটার দিকে লক্ষ্য করো। আবার অন্য চোখ দিয়ে একই কাজ করো। দেখতে পাবে দুই সময়ই বস্তুটিকে তার আসল অবস্থান হতে কিছুটা ডানে বা বামে সরে গিয়েছে। এই যে অবস্থানের তারতম্য ঘটলো এই ইফেক্টকেই প্যারাল্যাক্স বলা হয়। এইক্ষেত্রে ডানে ও বামে বস্তুর যে ভ্রম তৈরি হয়েছে তা থেকে তোমার দিকে দুটি রেখা কল্পনা করলে রেখা দুটি যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেখানে একটি কোণ তৈরি হয় । এরপর সাধারণ ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে গ্রিকরা পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করেছিল।

Stellar Parallax Method :

পরবর্তী সময়ে সূর্যকে ব্যবহার করে প্যারাল্যাক্সের মাধ্যমে নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপ করা হয় যাকে স্টেলার প্যারালাক্স পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতি পৃথিবী থেকে ৬ মাস পরপর একটি নক্ষত্র কতটুকু ডানে বামে সরেছে তা বের করা হয় এবং প্যারালাক্স কোণ নির্ণয় করা হয় তা থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। তবে নক্ষত্রটি যত দূরে থাকবে কোণটি তত ছোট হবে। তাই এই পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ৫০০০-১৬০০০ আলোকবর্ষ দূরত্ব পরিমাপ করা যায়।

$d(\text{pc}) \approx 1/p(\text{arcsec})$

এখানে pc হলো পারসেক (1 pc = 3.262 Lightyear)
p হলো প্যারালাক্স কোণ যা ১ ডিগ্রির ৩৬০০ ভাগের ১ ভাগ।

Spectroscopic Parallax Method :

বিজ্ঞানীরা ভাবলেন কীভাবে আরো দূরের নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপ করা যায়। তখন তারা ব্যবহার করলেন স্পেকট্রোস্কোপিক প্যারালাক্স পদ্ধতি।

এই পদ্ধতি বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের পৃষ্ঠতাপমাত্রা, আপাত ও পরম ঔজ্জ্বল্যের মাধ্যমে নক্ষের দূরত্ব নির্ণয় করে থাকেন। এখানে একটা কথা আমাদের মাথায় রাখা উচিত আপাত ঔজ্জ্বল্য ও পরম ঔজ্জ্বল্য দুটো এক জিনিস নয়। আপাত ঔজ্জ্বল্য হলো কোনো নক্ষত্র খালি চোখে কতটুকু উজ্জ্বল দেখায় সেটা আর পরম ঔজ্জ্বল্য হলো পৃথিবী থেকে **১০ পারসেক (10pc)** দূরত্বে কোনো তারার উজ্জ্বলতা কেমন তার মান।

আমাদের এই দুটির প্রয়োজন কারণ ২টি তারার আপাত ঔজ্জ্বল্য একই হলে তা বেশ কিছু বিষয় নির্দেশ করে। যেমন :

- নক্ষত্র দুটি সমান উজ্জ্বল এবং পৃথিবী থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত।
- একটি নক্ষত্র কম উজ্জ্বল কিন্তু পৃথিবীর কাছে অবস্থিত ফলে এটি পৃথিবী থেকে বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। আবার অন্য নক্ষত্রটি বেশি উজ্জ্বল কিন্তু পৃথিবী থেকে দূরে অবস্থিত ফলে এটি পৃথিবী থেকে কম উজ্জ্বল মনে হয়।

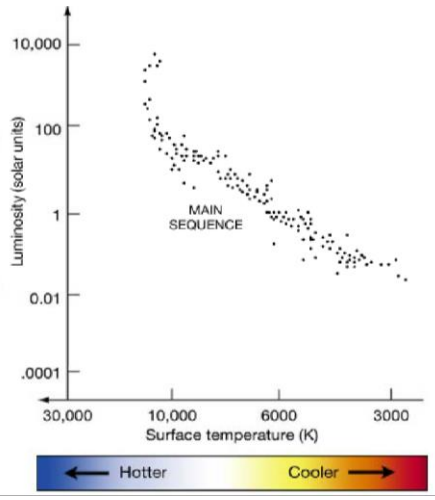

গ্রিকরা আপাত ঔজ্জ্বল্যতার উপর ভিত্তি করে তারাদের আলাদা করেন। 'Hipparchus Scale' অনুযায়ী তারার আপাত ঔজ্জ্বল্য ১-৬ পর্যন্ত হতে পারে। ১নং শ্রেণির তারাগুলো বেশি উজ্জ্বল ২নং শ্রেণির তারাগুলো ১নং থেকে কম উজ্জ্বল এভাবে চলতে থাকে। ঠিক তোমাদের রোল নাম্বারের মতো যে পরীক্ষায় বেশি নাম্বার পায় তার রোল তত বেশি সামনের দিকে। তবে ১নং শ্রেণির তারা থেকে ২.৫গুণ বেশি আপাত ঔজ্জ্বল্যতা দেখায় ২নং শ্রেণির তারা এভাবে চলতে থাকলে ৬নং শ্রেণির তারাগুলো ১নং শ্রেণির তারা থেকে (২.৫)^৫ গুণ তথা ১০০গুণ আপাত ঔজ্জ্বল্যতা দেখায়। এটা থেকে ১৮৫৬ সালে **বিজ্ঞানী পগসন** একটি সমীকরণ প্রদান করেন-

$$m_1 - m_2 = -2.5 \log (B_1 / B_2)$$

m_1, m_2 হলো দুটি তারার আপাত ঔজ্জ্বল্য ।
B_1, B_2 হলো দুটি তারার উজ্জ্বলতা ।

বর্তমানে ১নং শ্রেণির তারা থেকেও বেশি উজ্জ্বল তারা দেখা যায় ফলে মানটি ঋণাত্মক দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- সূর্যের আপাত ঔজ্জ্বল্য (-২৬.৮), আলফা সেন্টোরির আপাত ঔজ্জ্বল্য (-০.৩) , Vega-র আপাত ঔজ্জ্বল্য (০.০৩)

আপাত ঔজ্জ্বল্য পরিমাপের সমীকরণ হলো

$$m = -2.5 \log_{10}(B) + C$$

B হলো তারার উজ্জ্বলতা
C হলো তারাটি কোন ব্যান্ডে দেখা হয়েছে, যেমন- ultra-violet U, blue, B or visible V

এখন আপাত ও পরম ঔজ্জ্বল্য ও পগসনের সমীকরণ থেকে পাই,

$$M_{(absolute)} - M_{(apparent)} = -2.5 \log (B_1 / B_2)$$

$$M_{(absolute)} - M_{(apparent)} = -2.5 \log (F_1 / F_2) \quad [Brightness, B = Flux, F]$$

$$M_{(absolute)} - M_{(apparent)} = -2.5 \log \{(L1/4\pi d^2)/(L2/4\pi d'^2)\}$$

$$M_{(absolute)} - M_{(apparent)} = -2.5 \log (d'/d)^2 \quad [L_1=L_2 ; \text{একই তারা }]$$

$$M_{(absolute)} - M_{(apparent)} = -2\times2.5 \log (d'/d)$$

$M_{(absolute)} - M_{(apparent)} = -5 \log (d'/d)$

$M_{(absolute)} - M_{(apparent)} = -5\log (d'/10)$ *[আপাত ঔজ্জ্বল্যতার জন্য $d_i = 10pc$]*

$M_{(absolute)} - M_{(apparent)} = -5 \log d' + 5 \log 10$

$M_{(absolute)} - M_{(apparent)} = 5 \log d' - 5 \log 10$ *[(-1) দ্বারা উভয়পক্ষকে গুণ করে]*

$M_{(absolute)} - M_{(apparent)} + 5 = -5\log d'$

{M(apparent)- M(absolute)+5 }/5 = log d' {(m-M)+5}/5= log d'

[M(apparent)=m
M(absolute)= M]

d' = 10^[{(m-M)+5}/5]

এই সূত্র দিয়ে আমরা কোনো নক্ষের দূরত্ব পরিমাপ করতে পারি।

এই পদ্ধতি সর্বোচ্চ ১০০০০ পারসেক (10,000pc= 32615.638 light-years) দূরত্ব পরিমাপ করা যায়। এর চেয়ে বেশি পরিমাণ দূরত্ব পরিমাপ করতে বিজ্ঞানীরা HR diagram, Standard Candle method, Cepheid Variable Stars, Type Ia Supernova-র সাহায্য নিয়ে থাকেন।

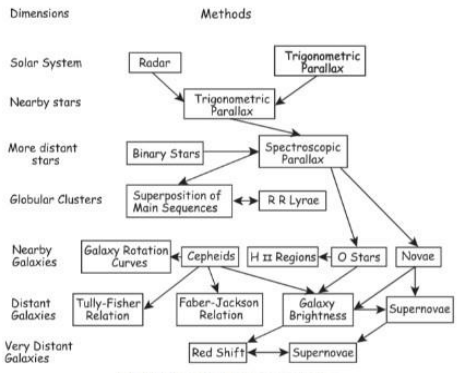

Fig. 2.4. Flow chart of distance indicators.

লেখকঃ মুহাম্মদ জোনায়েদ আলী,
একাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ,
নটরডেম কলেজ, ঢাকা।

ভেক্টর গুণের
গুণাগুণ
মাহমুদুল কবীর
কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট।

কখনো ভেবেছেন যে, ক্রস প্রোডাক্ট আর ডট প্রোডাক্ট আসলে কী বোঝায়? কেনই বা ডট করলে শূন্য আসলে লম্ব আর ক্রস করে শূন্য আসলে সমান্তরাল বলে? কেনইবা তিনটা ভেক্টর সমতলীয় কী না যাচাইয়ের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ব্যবহার করি আমরা? চলুন, আজকে আমরা সেটাই দেখব।

আগে আমরা দুইটা সূত্র দেখে আসি। প্রথমটা হলো ক্রস প্রোডাক্টের সূত্র :

একটা ভেক্টর এবং আরেকটা ভেক্টর হলে

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = ab\sin\theta$$

এইখানে হলো দুইটা ভেক্টরের মাঝের ক্ষুদ্রতর কোণ।আর ভেক্টর রূপ হলো:

$$\vec{A} \times \vec{B} = ab\sin\theta\hat{\eta}$$

যেখানে তীর চিহ্ন দেওয়া অক্ষরের লেখাগুলো হল ভেক্টর আর সাধারণগুলো হলো এদের মান। আর হলো আর যে সমতলে অবস্থিল তার লম্বদিকে একক ভেক্টর। আর নতুন যে ভেক্টর পাবেন সেটাকে বলে তল ভেক্টর। অর্থাৎ, ওই দুইটা ভেক্টর ও দ্বারা গঠিত তলকে এই ভেক্টর দ্বারা নির্দেশ করা যায়। এর মান হলো ওই তলের ক্ষেত্রফল, আর দিক হলো ওই তলের উপর লম্ব।

ক্রস গুণের একটা নির্ণায়ক আকারও আছে। যদি

$$\vec{A} = p\hat{i} + q\hat{j} + r\hat{k}$$
$$\vec{B} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

হয় তবে,

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{A} \times \vec{B} = (qz - ry)\hat{i} + (rx - pz)\hat{j} + (py - qx)\hat{k}$$

আমরা যেমন পাটিগণিতে × চিহ্ন দিয়ে গুণ বুঝাই ভেক্টরেও এইটা দিয়ে গুণ বুঝানো হয়। তবে কেবল ভেক্টর গুণ। দুইটা ভেক্টরের ভেক্টর গুণও একটা নতুন ভেক্টরের জন্ম দেয় যেটা হয় ওই দুই ভেক্টরের উপরই লম্ব।

এইবার চলুন দেখি ভেক্টর গুণ আসলে কী বুঝায়। ছোটবেলায় একটা সূত্র পড়েছেন। একটা ত্রিভুজের দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য ও এদের মধ্যবর্তী কোণ দেয়া থাকলে ক্ষেত্রফল,

$$\Delta = \frac{1}{2}ab\sin\theta$$

কী মিল পাচ্ছেন? এখন, এইটা থেকে যদি a আর b দ্বারা গঠিত সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল বের করতে চান তাহলে তার ক্ষেত্রফল কী হবে?

$$\Xi = 2\Delta = ab\sin\theta = \vec{A} \times \vec{B}$$

একটা ভেক্টরও যেহেতু একটা রেখা, তাই দুইটা ভেক্টর যদি দেয়া থাকে, তাহলে তাদের দ্বারা একটা সামান্তরিকও নিশ্চয়ই গঠিত হবে। এই সামান্তরিকটার ক্ষেত্রফলই হলো ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট-এর মান।

কিন্তু ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট আরেকটা ভেক্টর কেন? এটা বুঝার আগে আপনাকে জানতে হবে যে, ভেক্টর গুণ কেবলমাত্র 3D স্পেসে সংজ্ঞায়িত। আপনি চাইলেও 2D বা 4D স্পেসে ক্রস প্রোডাক্ট নিতে পারবেন না। এইটা কেবলমাত্র 3D স্পেসেই সম্ভব।

এখন দেখুন, 3D স্পেসে যখন আপনি দুইটা ভেক্টর নিয়ে একটা প্লেন বা তল ডিফাইন করলেন। কিন্তু ওই তলটা ঠিক কোনদিকে কীভাবে বিন্যস্ত তা আপনি কীভাবে বুঝবেন?

এইটা বোঝার জন্যই আমরা নতুন একটা ভেক্টর যেটা ওই তলের উপর লম্ব। এখন $|\mathbf{A}\times\mathbf{B}|$ দ্বারা যে ক্ষেত্রফল বুঝানো হয়, অর্থাৎ $ab\sin(\theta)$ তা অন্য অনেক ভেক্টর দ্বারা গঠন করা সম্ভব। অর্থাৎ একই ক্ষেত্রফলসম্পন্ন সামান্তরিক অনেক ধরনের বাহু ও কোণের কম্বনেশনে তৈরি করা সম্ভব। যেমন,

$$ab\sin\theta_1 = cd\sin\theta_2$$

তাই $\mathbf{A}\times\mathbf{B}$ দ্বারা যদি কেবল ক্ষেত্রফল বুঝানো হত তবে সেই তল কিভাবে 3D স্পেসে অবস্থান করছে তা আপনি বুঝতে পারতেন না।

যেমন, নিচের ছবিটার দিকে তাকান :

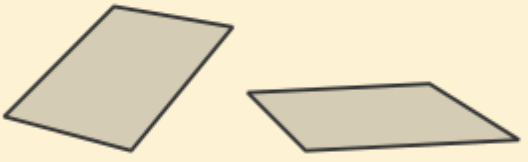

এইখানে এই দুইটা তলের ক্ষেত্রফলই সমান, কিন্তু এদের বিন্যাস ভিন্ন। এখন, এই দুইটা তলকে আপনি আলাদা করবেন কীভাবে? তার জন্যই ক্রস প্রোডাক্টকে ভেক্টর হিসাবে গণ্য করা হয়, যাকে বলা হয় তল ভেক্টর। এর মান দ্বারা ওই তলের ক্ষেত্রফল, এবং দিক দ্বারা ওই তলের বিন্যাস বুঝানো হয়। এই তল ভেক্টরটি থাকে আপনি যে তলকে ডিফাইন করতে চান, তার লম্ব বরাবর।

নিচের ছবিটার দিকে তাকান:

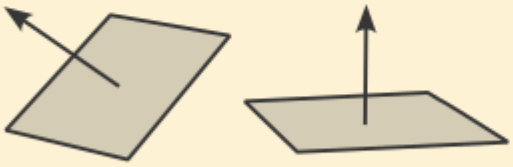

এখানে, দুইটা তলের তল ভেক্টরের মান সমান, কিন্তু দিক ভিন্ন। এর দ্বারা বুঝা যায় এই দুইটা তলের ক্ষেত্রফল সমান, কিন্তু 3D স্পেসে এরা ভিন্নভাবে বিন্যস্ত আছে। এবার আরেকটা জিনিস দেখি।

নিচের ছবিটার দিকে তাকান:

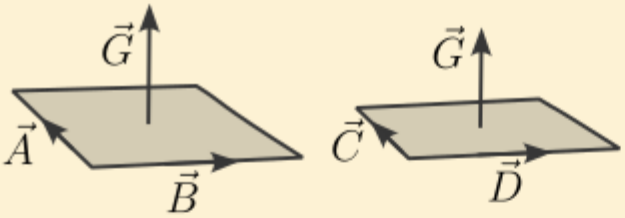

দেখুন, এখানে দুইটা তল ভেক্টরই একই। দুইটাই **G**। কিন্তু দুইটা তল অবশ্যই ভিন্ন। দুইটা তল ভিন্ন ভিন্ন ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্টের ফল। তাহলে আমরা কী বলতে পারি?

তল ভেক্টর দেখে আমরা একটা তলের ক্ষেত্রফল, ও তলের বিন্যাস জানতে পারি। কিন্তু সেই তলটা কোন দুই ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারি না। এটা তল ভেক্টরের একটা সীমাবদ্ধতা। আশা করি ক্রস গুণ পরিষ্কারভাবে বুঝা গিয়েছে। এখন আমরা কথা বলব ডট প্রোডাক্ট নিয়ে।

এটা আরো ইন্টারেস্টিং। দুইটা ভেক্টর **A** আর **B** নিলেন। এখন এদের ডট প্রোডাক্ট হবে

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta$$

এখানে, . (ডট) চিহ্ন দ্বারা ডট প্রোডাক্ট বুঝায়।

খেয়াল করে দেখবেন দুইটা ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট একটা স্কেলার। এই স্কেলার কী বোঝায় আসলে?

এই স্কেলার আসলে বোঝায় আয়তন।

এইখানে আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো। এই ডট প্রোডাক্ট কিন্তু ক্রস প্রোডাক্টের মত কেবল 3D স্পেসে সংজ্ঞায়িত নয়। এইটা n dimensional স্পেসেও সংজ্ঞায়িত।

3D স্পেসে এইটা আয়তন বোঝায়, কিন্তু উচ্চতর বা নিম্নতর ডাইমেনশনে এইটা কী বোঝায় সেটা আজকের আলোচনার বাইরে। কিন্তু এটা 3D স্পেসে আয়তন বোঝায় কীভাবে? যদি,

$$\vec{A} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$$
$$\vec{B} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$$

হয় তাহলে,

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

B যেহেতু একটা ভেক্টর, তাই একে দুইটা ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট আকারেও লেখা যায়। ধরি,

$$\vec{B} = \vec{C} \times \vec{D}$$

তাহলে,

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{A} \cdot (\vec{C} \times \vec{D})$$

যদি,

$$\vec{C} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}$$
$$\vec{D} = d_1\hat{i} + d_2\hat{j} + d_3\hat{k}$$

হয় তাহলে,

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{A} \cdot (\vec{C} \times \vec{D})$$

এখন, একটা সামান্তরিক আকৃতির ঘনকের আয়তনের সাধারণ সূত্র হলো = তলের লম্বদিকে তৃতীয় বাহুর উপাংশ (যেটাকে আমরা আদর করে উচ্চতা বলি) × তলের ক্ষেত্রফল
$= c\sin\theta_1 \times ab\sin\theta_2$

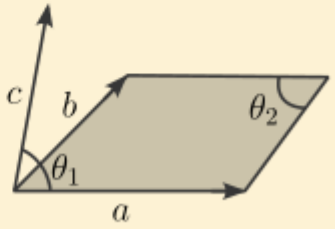

এইখানে c বাহুটা ab এর তলের সাথে θ1 কোণ তৈরি করেছে। আর a ও b নিজেদের মধ্যে θ2 কোণ উৎপন্ন করেছে। এবার আসুন, আমরা দেখি আয়তনের সাথে ডট ও ক্রস গুণের সম্পর্ক।

যদি **C** এবং **D** এর মধ্যবর্তী কোন θ এবং **B** অর্থাৎ, **C×D** ও **A** এর মধ্যবর্তী কোণ θ' হয় তাহলে, **A·(C×D)** = ?

$$\vec{C} \times \vec{D} = CD\sin\theta\hat{b}$$

যেখানে

$$\hat{b} = \frac{\vec{B}}{B}$$

অর্থাৎ **B** এর দিকের একক ভেক্টর। তাহলে,

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot (\vec{C} \times \vec{D}) &= \vec{A} \cdot \hat{b}(cd\sin\theta) \\ &= ab\cos\theta' \times cd\sin\theta\end{aligned}$$

কিন্তু **b** যেহেতু, একক ভেক্টর, তাই এর মান 1। তাহলে,

$$ab\sin\theta' \times cd\sin\theta = a\cos\theta' \times cd\sin\theta$$

সুতরাং, $\vec{A} \cdot (\vec{C} \times \vec{D}) = acd\cos\theta'\sin\theta$

তাহলে, এটার সাথে আয়তনের কী সম্পর্ক? এখানেই তো আসল মজা। নিচের ছবিটা দেখুন:

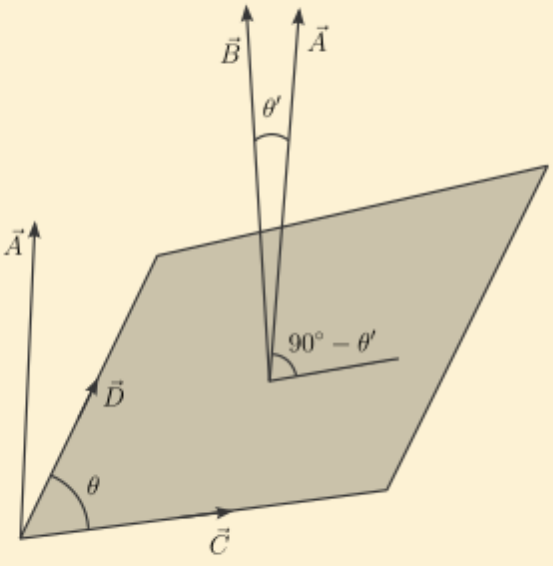

এইবার দেখুন তো এই সামান্তরিক আকৃতির ঘনকের তিনটা বাহু তিনটা ভেক্টর **A, C** ও **D**। এখানে, **C** ও **D** এর মধ্যবর্তী কোণ θ আর **C×D** অর্থাৎ, **B** ও **A** এর মধ্যবর্তী কোণ θ'।

তাহলে, **ACD** ঘনকের আয়তন = তলের লম্বদিকে তৃতীয় বাহুর উপাংশ (উচ্চতা) × তলের ক্ষেত্রফল

তলের ক্ষেত্রফল এইক্ষেত্রে = $|\mathbf{C\times D}| = cd\sin(\theta)$ আর উচ্চতা = $|\mathbf{A}|\sin(90° - \theta') = a\cos(\theta')$ তাহলে আয়তন হবে =

$$\begin{aligned}&cd\sin\theta \times a\cos\theta' \\ &= acd\cos\theta'\sin\theta\end{aligned}$$

কী এইটাকে চেনা চেনা লাগছে? একটু আগেই তো দেখলাম,

$$\vec{A} \cdot (\vec{C} \times \vec{D}) = acd\cos\theta'\sin\theta$$

তাহলে কী বুঝা গেল? বোঝা গেল যে, একটা সামান্তরিক আকৃতির ঘনকের তিনটা বাহু তিনটা ভেক্টর A, C ও D দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলে, এর আয়তন হবে = **A.(C×D)**

অর্থাৎ, একটা সামান্তরিক আকৃতির ঘনকের যেকোনো একটা তলের তল ভেক্টর ও অপর বাহুকে কোন ভেক্টর দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলে তার আয়তন হবে = **A.B** ; যেখানে **B** হলো তল ভেক্টর আর **A** হলো সেই অপর বাহুটি। আশা করি বুঝতে পেরেছেন ডট প্রোডাক্ট কীভাবে আয়তন নির্দেশ করে।

এখন, কোন সামান্তরিক আকৃতির ঘনকের তিনটা বাহু **A, C** ও **D** দ্বারা সংজ্ঞায়িত করলে এর আয়তন নির্ণায়কের সাহায্যেও নির্ণয় করা যায়। সেটা হলো,

$$\begin{aligned}\vec{A} &= a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k} \\ \vec{C} &= c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k} \\ \vec{D} &= d_1\hat{i} + d_2\hat{j} + d_3\hat{k}\end{aligned}$$

আয়তন = **A.(C×D)**

$$= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}$$

তো এবার বুঝবেন তিনটা ভেক্টর সমতলীয় হলে কেন এই নির্ণায়কের মান ০ দেখাতে হয়।

ভেবে দেখুন, আপনাকে একটা দ্বিমাত্রিক জিনিস দেয়া হলো এবং জিজ্ঞাসা করা হলো এটার আয়তন কত? আপনি কী বলবেন?

- শূন্য।

ঠিক তেমনই তিনটা ভেক্টর এক তলে থাকলে সেটা আসলে একটা দ্বিমাত্রিক জিনিস বুঝায় ও তাদের দ্বারা গঠিত ঘনকের আয়তন শূন্য। তাই আমরা উপরের নির্ণায়কটির মান শূন্য হলে বলি ভেক্টরত্রয় সমতলীয়। আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন।

এবার বলুনতো, ডট প্রোডাক্ট কেন ভেক্টর নয়? আসলে, ডট প্রোডাক্ট দিয়ে আয়তন বুঝানো হলেও, । একে 3D স্পেসে ভেক্টর দিয়ে বুঝানো যায়। কেন? কারণ 3D স্পেসে আয়তনকে ভেক্টর দিয়ে বুঝিয়ে আসলে তেমন কোন লাভ নেই।

কারণ এতে বস্তুর আকার আকৃতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা আপনি করতে পারবেন না।

আপনি হয়ত বললেন, বস্তুটির আয়তন x অক্ষের সাথে $30°$, y অক্ষের সাথে $60°$ আর z অক্ষের সাথে $45°$ কোণ উৎপন্ন করেছে।

একবার ভেবে দেখুন তো, এটা কী আপনার কাছে কোন সেন্স ক্রিয়েট করছে?

উত্তর হলো না। আর একারণেই ডট প্রোডাক্টকে সাধারণ স্কেলার দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

একনজরে নোবেল

'২৩ সাল

ও রসায়নে নোবেল

কোয়ান্টাম ডট

এই বছর রসায়নে নোবেল জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন বিজ্ঞানী যাদের নাম যথাক্রমে মুঙ্গি বাওয়েন্ডি, লুই ব্রুস,আলেক্সি ইয়াকিমভ। তাদের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কারণ কোয়ান্টাম ডট আবিষ্কার। অদ্ভুত শোনাতে এই কোয়ান্টাম ডট একপ্রকার সেমিকন্ডাক্টর যেটা সাধারণ সেমিকন্ডাক্টরের তুলনায় অনেক অনেক অনেক গুণ ছোটো। এজন্য ন্যানোপার্টিকেলও বলা হয়।

মাহমুদুল কবীর,
ক্যামিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যান্ড থিওরি

সাধারণত সেমিকন্ডাক্টরে যেসব পরমাণু থাকে, তারা থাকে কেলাস বা crystal আকারে। এদের আকার হয় কয়েক মিলিমিটার থেকে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত। এইসব কেলাসে যেসব পরমাণু থাকে, এরা যখন কেলাসে না থেকে একা একা থাকে, তখন এদের শক্তিস্তরগুলোতে একদম সুনির্দিষ্ট শক্তির ইলেকট্রন থাকে। ফলে এদের শক্তিস্তরগুলোও হয় একদম সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ, এদের শক্তিস্তরগুলো অনেক চিকন হয়। ফলে এদের চলাচলের জায়গা তেমন থাকে না।

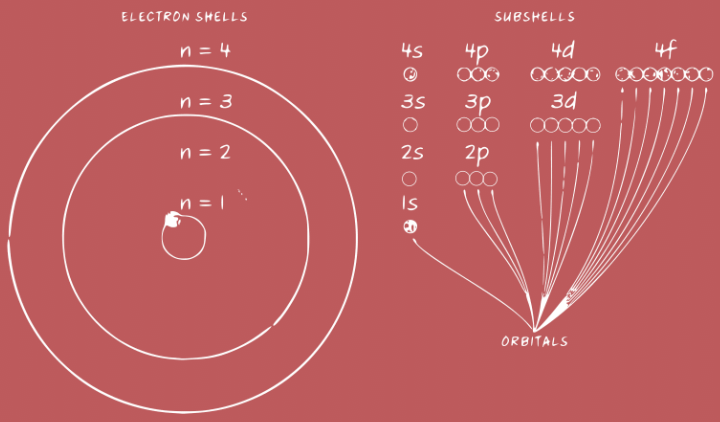

কিন্তু সেই একই পরমাণুর অনেকগুলো মিলে যখন কেলাস গঠন করে, তখন এদের সবার বাইরের শক্তিস্তরের ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। আর ধাক্কাধাক্কি মানেই ইলেকট্রনের বেগের তারতম্য। আর বেগের তারতম্য মানে এনার্জির তারতম্য। আর এনার্জির তারতম্য মানে শক্তিস্তরের তারতম্য। তো এই শক্তিস্তরের তারতম্য হওয়ার ফলে পরমাণুগুলোর শক্তিস্তরগুলো পাশাপাশি পরমাণুর নিজেদের মত কাছাকাছি শক্তির শক্তিস্তরগুলোর সাথে মিশে নতুন করে হাইব্রিড শক্তিস্তর তৈরি করে। এই হাইব্রিড শক্তিস্তরগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো এগুলোতে আর নির্দিষ্ট শক্তির ইলেকট্রন থাকে না, বরং একটা নির্দিষ্ট শক্তিসীমার মধ্যে ইলেকট্রন থাকে। অর্থাৎ, একটা সর্বোচ্চ এনার্জির ইলেকট্রন থাকবে আর একটা সর্বনিম্ন এনার্জির ইলেকট্রন থাকবে। ফলে, যে ইলেকট্রনগুলোর এনার্জি বেশি থাকবে, সেগুলো ব্যান্ডের বেশি বাইরের দিকে থাকবে, আর যেগুলোর এনার্জি কম থাকবে সেগুলো ব্যান্ডের বেশি ভিতরের দিকে থাকবে। তাহলে, ইলেকট্রনগুলো সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন এনার্জির মাঝে যেকোনো জায়গায় থাকতে পারে।

ফলে কক্ষপথটাও আর সুনির্দিষ্ট থাকে না। কক্ষপথগুলো অনেকটা ছড়িয়ে যায়। অর্থাৎ, ইলেকট্রনগুলো একটা সুনির্দিষ্ট শক্তিস্তরের শক্তির চেয়ে সামান্য বেশি শক্তির বা সামান্য কমশক্তির কক্ষপথেও ঘুরতে পারবে। ফলে, সেই কক্ষপথগুলো দেখতে অনেকটা মোটা ফিতার মত লাগে। ফলে, শক্তিস্তরগুলো অনেক জায়গা জুড়ে থাকে। ফলে ইলেকট্রনগুলো সিংগেল পরমাণুর শক্তিস্তরের তুলনায় অনেক বেশি জায়গায় ঘুরাঘুরি করতে পারে।

আবার, এনার্জি লেভেল বনাম ইলেকট্রনের গ্রাফ আঁকলে দেখা যায়, একটা পরমাণুতে এনার্জির জন্য অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন সরলরেখা পাওয়া গেলেও (যেগুলো প্রতিটা শক্তিস্তরের এনার্জি লেভেল নির্দেশ করে), কেলাসে এনার্জির জন্য পাওয়া যায় অনেকগুলো কন্টিনিউয়াস ব্যান্ড। এগুলোকে বলে এনার্জি ব্যান্ড।

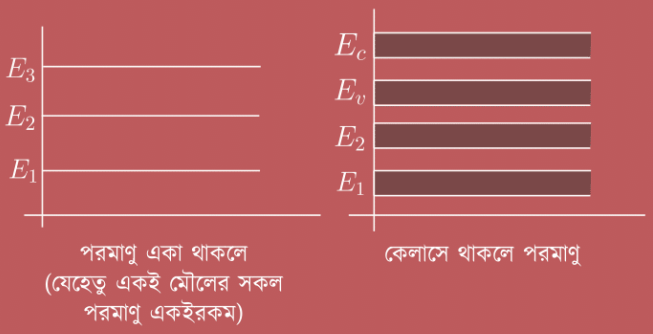

পরমাণু একা থাকলে (যেহেতু একই মৌলের সকল পরমাণু একইরকম)

কেলাসে থাকলে পরমাণু

ব্যান্ডগুলো কন্টিনিউয়াস হওয়ার কারণ

কন্টিনিউয়াস হওয়ার মানে হলো, ব্যান্ডগুলোর মাঝে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকবে না। ব্যান্ডগুলোর মাঝে প্রত্যেকটা এনার্জি লেভেল অধিকৃত থাকবে।

ব্যান্ডগুলো কন্টিনিউয়াস হওয়ার কারণ হলো, সেমিকন্ডাক্টরের কেলাসে থাকা অসংখ্য পরমাণু। আর সব পরমাণুতে কয়েকটা নির্দিষ্ট শক্তির কাছাকাছি শক্তির ইলেকট্রন থাকে যেগুলো একই ব্যান্ডের ইলেকট্রন হয়ে থাকে।

আমাদের আলোচনায় দুইটা ব্যান্ড অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একটা হলো যোজন ব্যান্ড আরেকটা হলো পরিবহন ব্যান্ড। যোজন ব্যান্ড হলো পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের ব্যান্ড যেটা সাধারণ তাপমাত্রায় ইলেকট্রন পরিপূর্ণ থাকে। আর পরিবহন ব্যান্ড হলো যোজন ব্যান্ডের বাইরের ব্যান্ড যেটা সাধারণ তাপমাত্রায় ইলেকট্রন পরিপূর্ণ থাকে না। পরিবহন ব্যান্ডের এনার্জি, যোজন ব্যান্ডের চেয়ে বেশি হয়।

সাধারণত, পরিবহন ব্যান্ডের এনার্জি, যোজন ব্যান্ডের এনার্জি অপেক্ষা বেশি হয়। যোজন ব্যান্ডের ইলেকট্রন বিদ্যুৎ পরিবহন করে না। তাপ দিলে বা অন্য কোনোভাবে ইলেকট্রনগুলো এনার্জি পেলে আস্তে আস্তে পরিবহন ব্যান্ডে যেতে থাকে। তখন সেমিকন্ডাক্টর ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ পরিবহন শুরু করে। এইযে যোজন ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডে নিতে যে পরিমাণ এনার্জি দেয়া লাগল এটাই হলো ওই সেমিকন্ডাক্টরের ব্যান্ড গ্যাপ। অর্থাৎ, কোন সেমিকন্ডাক্টরের পরিবহন ব্যান্ড আর যোজন ব্যান্ডের শক্তির পার্থক্য হলো ওই সেমিকন্ডাক্টরের ব্যান্ড গ্যাপ। সাধারণ সেমিকন্ডাক্টরের ব্যান্ড গ্যাপের মান তেমন বেশি হয়না। সামান্য এনার্জি দিলেই এরা যোজন ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডে চলে যায়।

কোয়ান্টাম কনফাইনমেন্ট

কোয়ান্টাম কনফাইনমেন্ট হয় যখন কোন সেমিকন্ডাক্টরের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়। এই অতিক্ষুদ্র আকারের কারণে কোয়ান্টাম ধর্মগুলো ভালোভাবে ফুটে উঠে ওই সেমিকন্ডাক্টরে। এরকমই একটা ধর্ম হলো কোয়ান্টাম কনফাইনমেন্ট।

সাধারণ সেমিকন্ডাক্টরে ব্যান্ড গ্যাপ খুব কম হয় এবং এনার্জি ব্যান্ডগুলো মোটামুটি কন্টিনিউয়াস হয়, একলা পরমাণুর শক্তিস্তরের এনার্জির মত কোয়ান্টাইজড হয়না। কিন্তু, যখনই কোন সেমিকন্ডাক্টরের ছোটো হতে থাকে, তখনই শুরু হয় এই ব্যান্ডগুলো ভাঙা, অর্থাৎ ব্যান্ডগুলো আর কন্টিনিউয়াস থাকে না, মাঝে ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। এনার্জিগুলো আবার একটা সিঙ্গেল পরমাণুর মত কোয়ান্টাইজড হতে থাকে, অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট হওয়া শুরু হয়। কারণ, একটা জিনিস ছোট হওয়া মানে সেখানে পরমাণু সংখ্যা কমা। পরমাণুর সংখ্যা কমলে ধাক্কাধাক্কি কমবে। ধাক্কাধাক্কি কমলে, বেগের ভ্যারিয়েশন কমবে, ফলে এনার্জির ভ্যারিয়েশন কমবে। যখন সেমিকন্ডাক্টর একেবারে ন্যানো স্কেলে চলে যায়, তখন এনার্জির ভ্যারিয়েশন অনেক বেশিই কমে যায়। এনার্জির ভ্যারিয়েশন কমলে, এনার্জি ব্যান্ডের গ্রাফগুলো আর এত সুন্দর কন্টিনিউয়াস থাকে না। ভেঙে কয়েকটা সুনির্দিষ্ট এনার্জির, কম ভ্যারিয়েশন যুক্ত গ্রাফে পরিণত হবে, অনেকটা সিঙ্গেল পরমাণুর মত, অর্থাৎ, এনার্জি লেভেল কোয়ান্টাইজড হওয়া শুরু হবে। ফলে শক্তিস্তরগুলোও আবার ব্যান্ডের থেকে আস্তে আস্তে সুনির্দিষ্ট হওয়া শুরু হবে অর্থাৎ, ব্যান্ডের মত মোটা না থেকে আস্তে আস্তে চিকন হওয়া শুরু করবে, যদিও সিঙ্গেল পরমাণুর মত অত চিকন হবে না। এর ফলে সিঙ্গেল পরমাণুর মতো এদেরও দুইটা ব্যান্ডের মধ্যে এনার্জির পার্থক্য বেশি হবে। ফলে এদের ভ্যালেন্স ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের এনার্জির পার্থক্যও বেশি হবে, অর্থাৎ, ব্যান্ড গ্যাপও বাড়বে। এই সকল কারণে ন্যানো স্কেলের সেমিকন্ডাক্টরগুলোকে সিঙ্গেল পরমাণু ও সাধারণ সেমিকন্ডাক্টরের মাঝামাঝি পদার্থ ধরা হয়।

তো, এই যে ইলেকট্রনগুলো আবার নির্দিষ্ট শক্তির কক্ষপথে ছোট জায়গায় বন্দি হওয়া শুরু করে, এটাকেই বলে কোয়ান্টাম কনফাইনমেন্ট। সেমিকন্ডাক্টর কেবলমাত্র ন্যানোস্কেল বা তার চেয়ে ছোট হলেই এই বৈশিষ্ট্যটা ভালোভাবে বোঝা যায়।

কোয়ান্টাম ডট

কোয়ান্টাম ডট হলো ন্যানোস্কেলের একধরনের সেমিকন্ডাক্টর। ফলে ন্যানো সেমিকন্ডাক্টর এর মত এর এনার্জি লেভেলও কোয়ান্টাইজড হবে এবং এর ব্যান্ড গ্যাপও হবে সাধারণ সেমিকন্ডাক্টরের তুলনায় বেশি। সাধারণ সেমিকন্ডাক্টরের তুলনায় এর ব্যান্ড গ্যাপ বেশি হওয়ায়, এতে অতিবেগুনী রশ্মি ফেললে এটা দৃশ্যমান অঞ্চলের আলো শোষণ করে। ফলে ভ্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো পরিবহন ব্যান্ডে যায়। এরপর আলো দেওয়া বন্ধ করলে ইলেকট্রনগুলো পুনরায় পরিবহন ব্যান্ড হতে ভ্যালেন্স ব্যান্ডে ফিরে আসে আর আগের শোষণ করা এনার্জি বিকিরণ করে আলো হিসেবে। ফলে কোয়ান্টাম ডটগুলো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকে যেটাকে ফটোলুমিনেসেন্স (আলো খেয়ে আলো ছাড়া) বলে।

অর্থাৎ ধরুন একটা সিংগেল পরমাণুর একটা কক্ষপথের ইলেকট্রনের এনার্জি ৫। সিংগেল থাকা অবস্থায় সব পরমাণুতে ওই কক্ষপথের ইলেকট্রনের এনার্জি ছিল ৫। এখন কেলাসে এসে ইলেকট্রনগুলোর মাঝে ধাক্কাধাক্কির ফলে একই শক্তিস্তরের ইলেকট্রনগুলো এই এনার্জির আশেপাশে অনেক এনার্জি লাভ করে। কোনটা বেশি এনার্জি লাভ করে, আবার কোনটা কম এনার্জি পায়। যেমন: 4.9, 4.8, 4.7, 5.1, 5.2 ইত্যাদি। এখন, যেসব ইলেকট্রনের এনার্জি 5 এর কাছাকাছি সেগুলো সবই একই ব্যান্ডের ইলেকট্রন হবে যাদের এনার্জি লেভেল হবে 4.9, 4.8, 4.7 ইত্যাদি। এই 5 এর আশেপাশের এনার্জি লেভেল বিশিষ্ট ইলেকট্রন সব পরমাণুতেই থাকবে। ফলে প্রত্যেকটা এনার্জি লেভেলের জন্য একটা সরলরেখা পাব। আর যতগুলো পরমাণু আছে ততগুলো সরলরেখা পাব, যেহেতু সব পরমাণুতেই ওই এনার্জি লেভেলের আশেপাশের এনার্জি লেভেল বিশিষ্ট ইলেকট্রন আছে। ফলে একই আমরা কাছাকাছি এনার্জি লেভেলের অনেকগুলো সরলরেখা একটা জায়গায় পাব। এখন এনার্জি লেভেলগুলো হয় একদম কাছাকাছি। ফলে একটা সরলরেখার একদম কাছাকাছি আমরা অনেকগুলা সরলরেখা পাব। এই সরলরেখার সংখ্যা অনেক অনেক অনেক বেশি হলে সরলরেখাগুলো একদম গায়ে গায়ে লেগে যাওয়ার মত হয়। ফলে দেখে মনে হয় সেখানে অনেকগুলো সরলরেখা নেই, বরং একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত পুরোটাই দখল করা। ফলে সেখানে একটা ব্যান্ড তৈরি হবে, যেটাকে এনার্জি ব্যান্ড বলে।

আবার, আরেকটা শক্তিস্তরের এনার্জি 6 হলে, কেলাসে এর আশেপাশেও অনেক ধরনের এনার্জি লেভেল বিশিষ্ট ইলেকট্রন পাব সবগুলো পরমাণুতে। ফলে এনার্জি 6 এর জন্যও এনার্জি ব্যান্ড পাব যেটা 5 এর জন্য পাওয়া ব্যান্ড হতে আলাদা হবে।

এভাবে সব পরমাণুর সব ইলেকট্রন হিসাব করলে এরকম 5, 6 এর মত অনেকগুলো এনার্জি লেভেল পাব, যেগুলোর আশেপাশের এনার্জি লেভেল বিশিষ্ট ইলেকট্রন সব পরমাণুতেই আছে। আর ওই লেভেলগুলোর প্রত্যেকটার জন্য আমরা একটা করে ব্যান্ড পাব। (এটাকে সহজভাবে বোঝার জন্য একটা কাগজ নিন। সেই কাগজে একদম কাছাকাছি অনেকগুলা সমান্তরাল সরলরেখা টানুন। দেখবেন দূর থেকে দেখতে অনেকটা মোটা ব্যান্ডের মত লাগবে)

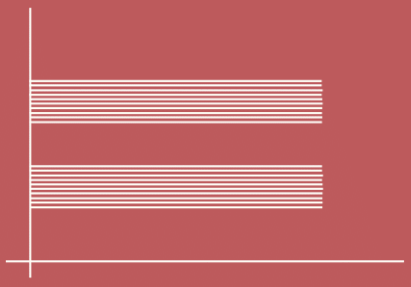

[দেখুন, অনেকগুলা সরলরেখা মিলে একটা ব্যান্ড তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকটা সরলরেখা একটা এনার্জি লেভেল বোঝায়। অনেক ইলেকট্রনের এনার্জি লেভেল অনেক রকম হবে। একই মৌলের কেলাসে অনেক পরমাণুর একই শক্তিস্তরের ইলেকট্রনগুলোর এনার্জি লেভেলে খুব সামান্য পার্থক্য থাকবে। তো অসংখ্য পরমাণুর অসংখ্য একই শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের অসংখ্য এনার্জি লেভেল থাকবে যেগুলো একদম কাছাকাছি থাকে। ফলে একদম কাছাকাছি এরকম অসংখ্য সরলরেখা থাকলে রেখাগুলো একদম লেগে যাবে পরস্পরের গায়ে। ফলে মাঝের ফাঁকা জায়গাগুলো আর থাকবে না। গ্রাফটাও হবে কন্টিনিউয়াস]

ফলে, পরমাণুগুলো একা থাকলে যেখানে এনার্জি বনাম ইলেকট্রন গ্রাফে অনেকগুলো সরলরেখা পাওয়া যায়, সেখানে কেলাসের পরমাণুগুলোর জন্য পাওয়া যায় অনেকগুলো কন্টিনিউয়াস ব্যান্ড। দুইটা ব্যান্ডের মাঝে যে ফাঁকা জায়গা থাকে, সেটাকে বলে নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড। কারণ এখানে ইলেকট্রন থাকা নিষিদ্ধ। সাধারণ সেমিকন্ডাক্টরে এই নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড অনেক তুলনামূলক ছোটো বা চিকন হয়।

ব্যান্ড তৈরির প্রভাব

ব্যান্ড তৈরি হওয়ার ফলে ইলেকট্রনগুলো যেমন সিঙ্গেল পরমাণুর তুলনায় বেশি জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে পারে, এনার্জি ভ্যারিয়েশন বেশি হয়, তেমনি সিঙ্গেল পরমাণুর দুইটি শক্তিস্তরের তুলনায় দুইটি ব্যান্ডের এনার্জির পার্থক্য কম হয়ে থাকে। কারণ যেহেতু ব্যান্ডগুলো অনেক জায়গাজুড়ে বিস্তৃত থাকে, তাই ব্যান্ডগুলোর মাঝের দূরত্বও কম। তাই, এদের ব্যান্ড চেঞ্জ করতে এনার্জিও লাগে কম। তাই অল্প এনার্জি পেলেই, এরা ব্যান্ড পরিবর্তন করে। কিন্তু সিঙ্গেল পরমাণুতে শক্তিস্তরগুলো অনেক চিকন হওয়ায়, এরা থাকে অনেক অল্প জায়গাজুড়ে। তাই, এদের মধ্যে দূরত্বও হয় বেশি। ফলে, শক্তিস্তর পরিবর্তন করতে এনার্জিও লাগে বেশি।

এই আলো খাওয়ার জন্য কোয়ান্টাম ডটকে অনেক ছোটো হতে হয়। কত ছোটো?

exciton bohr radius এর সঙ্গে তুলনা করা যায়, এত ছোটো। কোনো সেমিকন্ডাক্টরে অনেকগুলো হোলের মাঝখানে একটা ইলেকট্রন থাকতে পারে, আবার অনেকগুলো ইলেকট্রনের মাঝে একটা হোল থাকতে পারে। যখন এই ইলেকট্রন-হোল সিস্টেম সাম্যাবস্থায় থাকে, অর্থাৎ, টানাটানির নিট ফল শূন্য, তখন ইলেকট্রন আর হোলের মাঝে যে দূরত্ব থাকে সেটাই হলো exciton bohr radius। এটা একেক সেমিকন্ডাক্টরের জন্য একেক রকম হয়।

তো কোয়ান্টাম ডটগুলোর আকার এইগুলোর মত ছোটো হয়। এ কারণে কোয়ান্টাম ডটের আকার কেবলমাত্র 2-10 ন্যানোমিটার হয়ে থাকে।

এই ফটোলুমিনেসেন্স ধর্মের কারণে LED, TV, Surgery-সহ অনেকক্ষেত্রে এই কোয়ান্টাম ডট ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আর এই কোয়ান্টাম ডট আবিষ্কার ও তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্যই পূর্বোক্ত তিনজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ২০২৩ সালে রসায়নে নোবেল বগলদাবা করে বাড়িতে নিয়ে যান।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল ২০২৩

২০২৩ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বীকৃতিস্বরূপ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন হাঙ্গেরির ক্যাটালিন ক্যারিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রের ড্রু উইসম্যান। মূলত নিউক্লিওসাইড বেস পরিবর্তনের ক্ষেত্র তাদের আবিষ্কারের জন্য, যা কোভিড-১৯ এর জন্য কার্যকরী mRNA ভ্যাকসিন তৈরিতে অসামান্য অবদান রেখেছিলো। করোনা মহামারির করাল গ্রাসে যখন লাখ লাখ প্রাণ ঝরে পড়ছিলো, তখনই করোনা প্রতিষেধকের খোঁজে সারা পৃথিবীর গবেষকরা কাজ শুরু করে। যার দরুণ মহামারি শুরুর মাত্র কয়েকমাস পর ফাইজার এবং মডার্না ভ্যাকসিন তৈরির ঘোষণা দেয়। যদিও বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে তারা যেই খাতে অবদান রেখেছিলেন তা ২০০৫ সালের, কোভিড আসারও প্রায় পনেরো বছর আগের। তাদের এই উদ্ভাবনের ফলে স্বল্প সময়ের মাঝে ফাইজার ওবং মডার্না প্রথমবারের মতো ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে। ইতঃপূর্বে ভ্যাকসিন তৈরিতে বছরের পর বছর সময় লাগত, সর্বশেষ ইবোলার ভ্যাকসিন তৈরিতেও লেগেছিল ৩ বছর। যা শুধু করোনা নয়, আগামিতে যে-কোনো মহামারি মোকাবেলায় অন্যতম বিপ্লবের সূচনা করে।

মহামারিপূর্ব ভ্যাক্সিন

শরীরে প্রবেশকারী জীবানুর বিরুদ্ধে ইমিউন প্রতিক্রিয়া গঠনকে ত্বরাণ্বিত করে এই ভ্যাকসিনেশন। রোগাক্রান্ত শরীরকে উক্ত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার সক্ষমতা দান করে। মৃত বা দুর্বল ভাইরাসের বিরুদ্ধে আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন এখনও সমাদৃত যেমন: পোলিও, হাম ও হলুদ জ্বরের বিরুদ্ধে আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন। ১৯৫১ সালে ম্যাক্স থিলার হলুদ জ্বরের ভ্যাক্সিন তৈরির জন ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমান যুগে আণবিক জীববিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে সম্পূর্ণ ভাইরাস ছাড়াই ভাইরাসের ক্ষুদ্র অংশের উপর ভিত্তি করেও ভ্যাকসিন তৈরি সম্ভব হয়েছে। ভাইরাল জেনেটিক

কোডের অংশগুলো সাধারণত ভাইরাসের পৃষ্ঠে পাওয়া এনকোডিং প্রোটিন, যা প্রোটিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এবং তা ভাইরাস প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি গঠনকে উদ্দীপিত করে। উদাহরণস্বরূপ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এবং হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস বা HPV প্রতিরোধে আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন উল্লেখযোগ্য। আবার আরেকভাবে, ভেক্টর (যা একটি ডিএনএ মলিকিউল, জেনেটিক বস্তুকে পোষক দেহে পরিবহন করতে ব্যবহৃত) এর মাধ্যমে ভাইরাল কোডটি স্থানান্তরিত করা যায়। এই পদ্ধতিটি ইবোলা ভাইরাসের ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিলো। ফলে যখন ভেক্টর ভ্যাকসিন শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তখন নির্ধারিত ভাইরাল প্রোটিন কোষে উৎপাদিত হয়ে ভাইরাসের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

সম্পূর্ণ ভাইরাস, প্রোটিন, এবং ভেক্টর ভিত্তিক ভ্যাকসিন তৈরিতে প্রয়োজন বিশাল সংখ্যক সেল কালচার। এই প্রক্রিয়াটি মহামারি প্রাদুর্ভাব কিংবা মহামারির সময় দ্রুত ভ্যাকসিন উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই গবেষকরা কোষ কালচারের বাহিরে গিয়ে ভ্যাক্সিন তৈরির প্রযুক্তি গঠনের চেষ্টা করছিলেন।

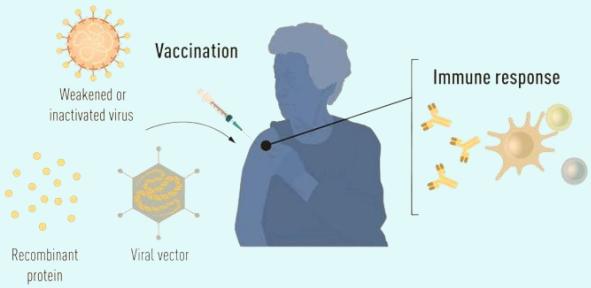

ছবি: করোনাপূর্ব ভ্যাক্সিনেশন পদ্ধতি। ক্রেডিট: নোবেল কমিটি অব মেডিসিন, ম্যাটিস কার্লেন।

mRNA ভ্যাকসিনের যাত্রা

আমাদের কোষে মূলত ডিএনএ-তে এনকোড করা জেনেটিক তথ্য মেসেঞ্জার আরএনএ (mRNA) -তে স্থানান্তরিত হয়, যা প্রোটিন উৎপাদনের টেমপ্লেট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, ১৯৮০-এর দিকে সেল কালচার ছাড়াই mRNA উৎপাদনের জন্য কার্যকর পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল, যাকে বলা হয় ইন ভিট্রো ট্রান্সক্রিপশন। ভ্যাকসিন এবং চিকিৎসার উদ্দেশ্যে mRNA প্রযুক্তি ব্যবহার করার যাত্রা শুরু হলেও চলার পথ মোটেও সহজ ছিলো না। ইন ভিট্রো টান্সক্রাইবড mRNA সরবরাহ করা চ্যালেঞ্জিং ছিল, যেখানে mRNA -কে এনক্যাপসুলেট করতে প্রয়োজন হয় অত্যাধুনিক লিপিড ক্যারিয়ার সিস্টেমের। তাছাড়াও ভিট্রো-উৎপাদি mRNA -কে প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাতেও দায়ী করা হয়। । তাই ক্লিনিকাল উদ্দেশ্যে mRNA প্রযুক্তির বিকাশ হয়ে পড়ে সীমাবদ্ধ। তবে এই বাধা-বিপত্তি হাঙ্গেরিয়ান জৈব-রসায়নবিদকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। mRNAকে থেরাপির কাজে লাগাতেই ক্যাটালিন ক্যারিকো জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সহকর্মী ড্রু উইসম্যান ডেনড্রাইটিক কোষ (ইমিউন নজরদারি এবং ভ্যাকসিন দ্বারা ইমিউন প্রতিক্রিয়া সক্রিয়) নিয়ে উৎসাহিত ছিলেন। ফলস্বরূপ নতুন পরিকল্পনা নিয়ে RNA এর প্রকারগুলো কীভাবে ইমিউন সিস্টেমকে প্রভাবিত করে তার উপর চলতে থাকে গবেষণা।

যুগান্তকারী পরিবর্তন

গবেষকদ্বয় খেয়াল করেন, ডেনড্রাইট কোষগুলো ইন ভিট্রো টান্সক্রাইবড mRNA-কে দেহের জন্য বহিরাগত শত্রু হিসেবে দেখছে, এবং প্রদাহজনক সংকেত অণু নিঃসৃত করে। তারা অবাক হন, স্তন্যপায়ী প্রাণিদেহের mRNA ইন ভিট্রো টান্সক্রাইবড mRNA এর মতো একই রিয়েকশন দেখায় না। এবং ধারণা করেন, কিছুটা আলাদা উপাদান রয়েছে এই mRNA এর আচরণের পেছনে।

RNA চারটা বেস দিয়ে গঠিত, A, U, G, C যেখানে DNA গঠিত হয় A, T, G এবং C দিয়ে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের RNA বেশ দ্রুত রাসায়নিকভাবে পরিবর্তন হয়, যেখানে ইন ভিট্রো টান্সক্রাইবড তার উলটো। mRNA এর বিভিন্ন ইউনিক ধরণ রাসায়নিকভাবে তৈরী করা হয় বেসের মাঝে এবং ডাইড্রেন্ট কোষে প্রদান করা হয়। অবাক করা বিষয় হলো, এবারে কোনো প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। যার ফলে বিভিন্ন ধরণের mRNA -কে আলাদাভাবে চেনা ও প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ধারণার বেশ বড়ো পরিবর্তন এনে দেয়! mRNA চিকিৎসাক্ষেত্রেও ব্যবহারযোগ্য, তা বোঝা সম্ভব হয়। এবং করোণার প্রায় ১৫ বছর পূর্বে তাদের আবিষ্কার গবেষণা আকারে প্রকাশিত হয়।

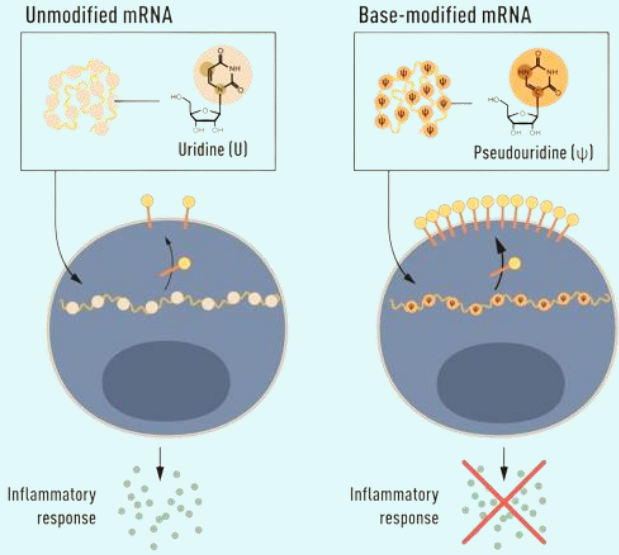

ছবি: mRNA-তে চারটি ভিন্ন বেস রয়েছে, সংক্ষেপে A, U, G এবং C। নোবেল বিজয়ীরা আবিষ্কার করেছেন যে, বেস-পরিবর্তিত mRNA প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়ার চালু (সংকেত অণুর নিঃসরণ) বন্ধ করতে এবং mRNA কোষে করা হলে প্রোটিন উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্রেডিট: নোবেল কমিটি অব মেডিশিন, ম্যাটিস কার্লেন।

গবেষকদ্বয় বিস্তারিত আরও গবেষণা ২০০৮ ও ২০১০ সালে প্রকাশ করেন। যেখানে দেখা যায়, কোষে বেস পরিবর্তন করা mRNA প্রদান করলে প্রোটিন উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হয়েছে অপরিবর্তিত mRNA এর থেকে। যদিও তাদের আবিষ্কারের মাধ্যমে বেস পরিবর্তনের ফলে প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া হ্রাস করে এবং প্রোটিন উৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি করে, তবে এটাই ক্লিনিক্যালি mRNA এর ব্যবহারের পথের সকল বাধা সরে যায়।

mRNA ভ্যাকসিনের সাফল্য

mRNA ভ্যাকসিনের জনপ্রিয়তা যখন আকাশছোঁয়া, ২০১০ সালের দিকে, বিভিন্ন কোম্পানি ঐ পদ্ধতি রপ্ত করার দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। জিকা ভাইরাস এবং MERS-CoV-এর বিরুদ্ধে ভ্যাকসিনগুলি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল; পরবর্তী মহামারীর ভাইরাস SARS-CoV-2 এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। COVID-19 মহামারী প্রাদুর্ভাবের পরে, SARS-CoV-2 এর সার্ফেস প্রোটিন এনকোডিং দুটি বেস-মডিফায়েড mRNA ভ্যাকসিন বেশ স্বল্প সময়ে তৈরি করা হয়েছিল। ৯৫%-এর মতো প্রতিরক্ষামূলক প্রভাব দেখাতে সক্ষম ভ্যাক্সিনদ্বয়। উভয় ভ্যাকসিনই ২০২০ এর ডিসেম্বরের দিকে অনুমোদিত হয়। এর বহুল জনপ্রিয়তা এবং গতির ফলে mRNA ভ্যাকসিনগুলি অন্যান্য সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিনগুলির জন্যও নতুনভাবে গঠনের পথ প্রশস্ত করছে। ভবিষ্যতে, প্রযুক্তিটি থেরাপিউটিক প্রোটিন প্রয়োগ এবং কিছু ধরণের ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

mRNA ছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতিতে SARS-CoV-2-এর বিরুদ্ধে আরও বেশ কয়েকটি ভ্যাকসিনও দ্রুত আবিষ্কার করা হয়েছিল। যার ফলে একইসাথে বিশ্বব্যাপী ১৩ বিলিয়নেরও বেশি কোভিড-১৯ টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে। ভ্যাকসিনগুলি লক্ষাধিক জীবন বাঁচিয়েছে এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর রোগ প্রতিরোধ করেছে। বিশ্বকে আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার পথ প্রশস্থ করেছে। যদিও এই আবিষ্কারের মাধ্যমে mRNA -তে বেস পরিবর্তনের গুরুত্ব বোঝা যায়, তাও এই বছরের নোবেল বিজয়ীরা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য সংকটের অবস্থায় পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নয়নে বিশাল অবদান রেখেছেন।

লেখকঃ সানজিদা ইসলাম শেফা,
একাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ,
শহীদ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান কলেজ

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ২০২৩

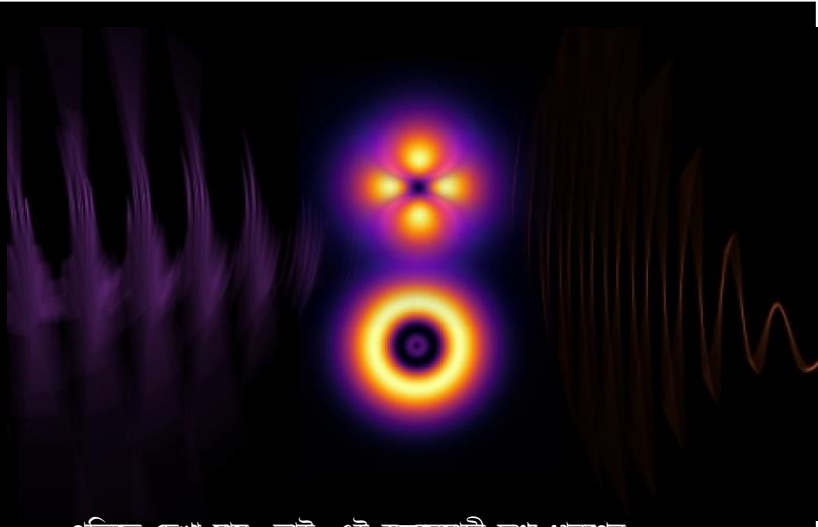

রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস ২০২৩ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিন গবেষককে: পিয়েরে অগোস্টিনি (ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি, কলম্বাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ফেরেঙ্ক ক্রাউস (ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট অফ কোয়ান্টাম অপটিক্স, গার্চিং এবং লুডভিগ-ম্যাক্সিমিলিয়ান-ইউনিভার্সিটি, মুনচেন, জার্মানি), এবং অ্যান ল'হুইলিয়ার (লুন্ড ইউনিভার্সিটি, সুইডেন)। তারা পরীক্ষামূলক পদ্ধতির জন্য যা পদার্থের ইলেকট্রন গতিবিদ্যার অধ্যয়নের জন্য আলোর অ্যাটোসেকেন্ড স্পন্দন তৈরি করেন।

আলোর পরীক্ষাগুলো সবচেয়ে কম মুহূর্তের হয়:

পদার্থবিজ্ঞানে তিনজন নোবেল বিজয়ী যেটা আবিষ্কার করেছেন, সেটা মানবজাতিকে পরমাণু সেই ইলেকট্রনের জগতে অতুলনীয় হাতিয়ার হিসেবে থাকবে। তিন গবেষক ইলেকট্রনের গতি বা শক্তির পরিবর্তন সনাক্ত করতে সক্ষম অতি ক্ষুদ্র লাইট-পালস আবিষ্কার করেছেন।

দ্রুত গতির যে-কোনো কিছু একসাথে ঝাপসা দেখায়, অনেকটা একটি 'স্ট্যাটিক-ইমেজ' মুভির মতই কন্সটেন্ট

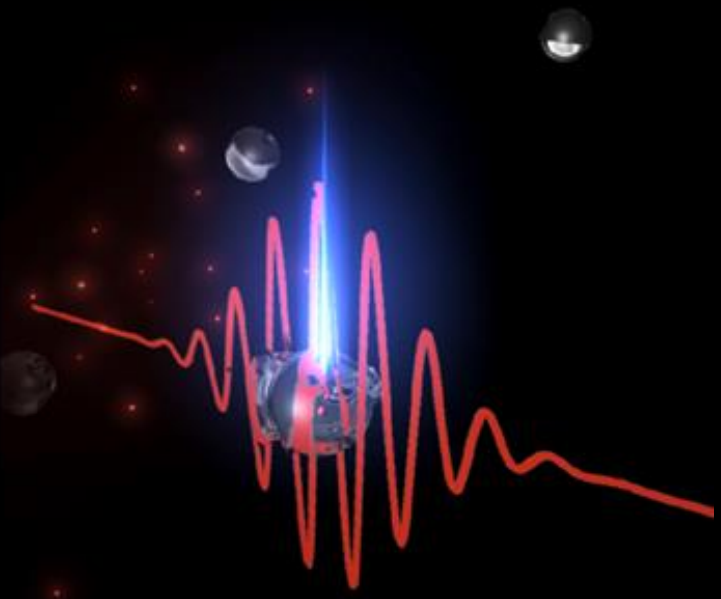

গতিতে দেখা যায়। তাই, এই স্বল্পমেয়াদী দৃশ্য ধারণের জন্য বিশেষ ক্যামেরা প্রয়োজন। এই দৃশ্য সময়ের পরিবর্তন এক অ্যাটোসেকেন্ডের দশমাংশে ঘটে; যা এত ছোটো, এক সেকেন্ডই যেনো সেই সময়ের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অতিবাহিত সেকেন্ডের সংখ্যার সমান। যেখানে, এক অ্যাটোসেকেন্ড হলো এক সেকেন্ডের ১০^১৮ ভাগের এক ভাগ। বিজয়ীদের গবেষণায় অ্যাটোসেকেন্ডের মতো সংক্ষিপ্ত লাইট-পালস তৈরি করা হয়েছে, যা বোঝায় যে এই পালসগুলো পরমাণু এবং অণুর ভিতরে কার্যকলাপের ছবি তুলতে সক্ষম।

১৯৮৭ সালে, অ্যান ল'হুইলিয়ার এক নোবল গ্যাসের মধ্য দিয়ে ইনফ্রারেড লেজারের আলো প্রবেশ করানোর সময়

বিভিন্ন ধরনের আলোর ওভারটোন খুঁজে পান। প্রতিটি লেজার আলো চক্রের জন্য, প্রতিটি ওভারটোন হলো একটি আলোকতরঙ্গ, যার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক চক্র রয়েছে। যখন লেজার আলো একটি গ্যাসের পরমাণুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে, তখন নির্দিষ্ট ইলেকট্রনের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং আলো হিসাবে মুক্তি পায়। অ্যান ল'হুইলিয়ার এই ঘটনাটি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে গিয়েছেন, ভবিষ্যতের ফলাফলের জন্য কাঠামো তৈরি করেছেন।

২০০১ সালে, পিয়েরে অ্যাগোস্টিনি শুধুমাত্র ২৫০ অ্যাটোসেকেন্ড স্থায়ী লাইট-পালসের একটি সিক্যুয়েন্স তৈরি এবং স্টাডি করেছেন। ফেরেঙ্ক ক্রাউস আরেকটি পরীক্ষায় কাজ করছিলেন যেখানে তিনি একটি একক ৬৫০ অ্যাটোসেকেন্ডের লাইট-পালস বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাদের এই আবিষ্কার সম্পর্কে নোবেল কমিটির ইভা ওলসন (Eva Olsson) বলেন, *"আমরা এখন ইলেকট্রনের জগতে প্রবেশ করতে পারি।*

অ্যাটোসেকেন্ড-পদার্থবিদ্যা আমাদের ইলেক্ট্রন-শাসিত সিস্টেমগুলো বুঝতে সাহায্য করবে। পরবর্তী ধাপে সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।”

নিঃসন্দেহে এর বাস্তব প্রয়োগ বিস্তৃত। উদাহরণস্বরূপ, একদিকে ইলেকট্রনিক্সে একটি উপাদানে ইলেকট্রনের আচরণ বোঝা এবং নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, অ্যাটোসেকেন্ড পালসগুলো বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য মেডিকেল ডায়াগনস্টিক্সেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্র আগামিতে দেখতে পাওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

লেখক: মোঃ সিফাত হাসান, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের ওয়েবসাইটে পাবেন বিজ্ঞানের নানা ব্লগ ও আমাদের বিজ্ঞান সাময়িকীর পূর্বের সংখ্যাগুলো

http://tachyonts.com

গণিত কুইজ ০২

১. 1 সেকেন্ড 1 ডিগ্রি কোণের কত অংশ?
ক) 0.00027 ডিগ্রি খ) 0.00028 ডিগ্রি
গ) 0.00026 ডিগ্রি ঘ) 0.00025 ডিগ্রি

২. $y = \pm x$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কোনটি হবে?
ক) $\pi/4$ খ) $\pi/3$ গ) $\pi/2$ ঘ) $3\pi 4$

৩. সিঁথি তাজিন ডং পাহাড়ে ওঠার সময় মোট ১১ দিন বৃষ্টি হতে দেখেছে। বৃষ্টির দিন সকালে না হয় বিকালে বৃষ্টি হয়। কিন্তু একই দিনে সকালে ও বিকালে বৃষ্টি হয় না। সিঁথি মোট ১৬ টি সকাল ও ১৩ টি বিকাল বৃষ্টি ছাড়া কাটালে, পাহাড়ে উঠতে তার কত দিন লেগেছে?
ক) ১৭ খ) ১৮ গ) ১৯ ঘ) ২০

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ০২

১. কোন তরঙ্গের তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি?
ক) রেডিও খ) মাইক্রোওয়েভ
গ) ইনফ্রারেড ঘ) গামা-রে

২. কোনটি পদার্থ বিজ্ঞানের শাখা নয়?
ক) বল বিজ্ঞান খ) তাপ বিজ্ঞান
গ) ইলেক্ট্রনিক্স ঘ) পরিবেশ বিজ্ঞান

৩. 'বস্তু থেকে চোখে আলো আসে বলেই আমরা বস্তুকে দেখি' - এটি কার উক্তি?
ক) নিউটন খ) ম্যাক্স প্লাঙ্ক
গ) ম্যাক্সওয়েল ঘ) আল হাজেন

রসায়ন কুইজ ০২

১. মানবদেহের সবচেয়ে বড় রাসায়নিক উপাদান কোনটি?
ক) ক্যালসিয়াম খ) কার্বন
গ) হাইড্রোজেন ঘ) অক্সিজেন

২. মার্স গ্যাস কোনটি?
ক) মিথেন খ) সালফার ডাই-অক্সাইড
গ) নাইট্রোজেন ঘ) কার্বন মনোক্সাইড

৩. কার্বোহাইড্রেটে সাধারণত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কী অনুপাতে থাকে?
ক) ১:১ খ) ১:২ গ) ২:১ ঘ) ৩:১

জীববিজ্ঞান কুইজ ০২

১. পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রজননশীল জীবাণু কোনটি?
ক) ব্যাকটেরিয়া খ) আর্কিয়া
গ) ছত্রাক ঘ) ভাইরাস

২. চোখের বিভিন্ন অংশের পুষ্টি যোগায় কোনটি?
ক) কর্নিয়া খ) রেটিনা
গ) স্ক্লেরা ঘ) কোরয়েড

৩. মানব মস্তিষ্কের কোন অংশটি বুদ্ধি, স্মৃতি এবং আবেগের কেন্দ্র?
ক) সেরেবেলাম
খ) পনস
গ) সেরেব্রাম
ঘ) মেডুলা

মহাকাশ কুইজ ০২

১. চাঁদের কোন দশায় সূর্যগ্রহণ হয়?

ক) পূর্ণিমা খ) প্রথম চতুর্থাংশ

গ) শেষ চতুর্থাংশ ঘ) অমাবস্যা

২. ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্বের প্রাথমিক প্রমাণ কী?

ক) গ্রাভিটেশনাল লেন্সিং খ) ডার্ক এনার্জি তারতম্য

গ) নিউট্রিনো নির্গমন ঘ) গ্যালাকটিক চৌম্বক ক্ষেত্র

৩. এক অ্যাস্ট্রোনোমিকাল ইউনিট (AU) দ্বারা কী বোঝায়?

ক) পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে গড় দূরত্ব

খ) আলো এক বছরে অতিক্রান্ত দূরত্ব

গ) সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব

ঘ) পৃথিবীর ব্যাসার্ধ

উত্তর পাঠাতে পাঠান আমাদের ফেইসবুক পেইজে কিংবা ই-মেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। সেরা তিন উত্তরদাতার নাম প্রকাশ পাবে আগামি সংখ্যার ম্যাগাজিনে।

ফেইসবুক পেইজ: www.facebook.com/TachyonTs

ই-মেইল: editortachyon@gmail.com

গণিতের ধাঁধা

১. 1,3,4,6 অঙ্কগুলো একবার ব্যবহার করে এবং (+/-/×/÷) এই চারটি অপারেটর ব্যবহার করে 24 বানাতে হবে । কীভাবে? চিন্তা করুন!

২. সাফিনের বয়স যখন চার , তখন তার ছোট বোন নাদিয়ার বয়স তার বয়সের অর্ধেক। বর্তমানে সাফিনের বয়স ১০ বছর হলে নাদিয়ার বয়স কত?

৩. রাতুল ও প্রজ্ঞা একটি খেলা খেলছে, সেটি হলো যে প্রথমে ২০ বলতে পারবে সে জিতে যাবে। নিয়ম হলো ১,২ একসাথে বা আলাদা করে একটা অঙ্ক বলা যাবে। (অর্থাৎ রাতুল বলতে পারে ১ বা ২ অথবা ১,২ একসাথে, প্রজ্ঞা বলতে পারে ৩,৪ বা ৩,৪ একসাথে, অর্থাৎ সর্বোচ্চ ২ টি অঙ্ক একসাথে বলা যাবে) । রাতুল যদি প্রথমে ১,২ একসাথে বলে শুরু করে তাহলে তার জেতার সম্ভাবনা কত?

ট্যকিয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত আছে যারা

কন্টেন্ট রাইটিং টিম

মো মুনেম শাহরিয়ার - ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
মাহমুদুল কবীর - বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
মেহেদী হাসান মিফতী - বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ
জান্নাতুল নাইম - মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
মোঃ কাউসার উদ্দিন আহমেদ - মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
মো: নাঈম - রাঙামাটি মেডিক্যাল কলেজ
আসিফ শাওয়াল - জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ কামরুল হাসান - রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ
সাজিদ খান - নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
রাতুল আঢ্য - সরকারি কেশব চন্দ্র কলেজ, ঝিনাইদহ
আফিয়া মুবাশ্বিরা - রাজশাহী কলেজ
নজরুল ইসলাম মজুমদার - ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)
ফাহিম হাসান - ইসলামিক ইউনিভার্সিটি
লাবিব বিন শাহেদ - ব্রাক ইউনিভার্সিটি
হিমেল দাস - বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া
নুসরাত জাহান - কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড মডেল কলেজ
মো রাকীবুল নেওয়াজ মাহিব - ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
জাকিয়াতুল জান্নাত - রৌমারী মহিলা ডিগ্রী কলেজ
রুশলান রহমান দীপ্ত - মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি
মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
তারুণ্য সেন - চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
মো. ইউসুফ আকন্দ সুহৃন - রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
মো: মুজাহিদ আল শিশির - রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ
কাজী সাফেন হাসান রিশাত - সরকারি বাঙলা কলেজ
মুহাম্মদ জোনায়েদ আলী - নটর ডেম কলেজ
আনজুম শুভ্রা - শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সিহাব আল রাতুল - গ্রাসরুটস কলেজ অব টেকনোলজি,
মুনতাহা ফায়েজ - চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ,
দিন ইসলাম - শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
রাফি আল মুরসালীন- উত্তরা উচ্চবিদ্যালয় এবং কলেজ
শ্রাবন্তী রেজা রাফা - সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা
কৃষ্ণ সাহা - ঢাকা কলেজ,
দেলোয়ার হোসেন - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

গাজী হেলাল উদ্দিন - সরকারি বি এল কলেজ
মোহিউদ্দিন জনি - আখাউরা ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ
সৌভিক সরকার - শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
মোঃ নাইম হোসেন - রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
নুসরাত জাহান মনি - কুমিল্লা কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ
পান্থ প্রতিক সরকার - বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
তোহাহা ফায়েজ - সাজেদা আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

ম্যাগাজিন টিম

মাহমুদুল কবীর - বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
মেহেদী হাসান মিফতী - বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ
জাকিয়াতুল জান্নাত - রৌমারী মহিলা ডিগ্রী কলেজ
রাতুল আচ্য - সরকারি কেশব চন্দ্র কলেজ, ঝিনাইদহ
সানজিদা ইসলাম শেফা - শহীদ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান কলেজ,
সৈয়েদা তাসনিম - বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ
মো: সোহেদুজ্জামান বসুনিয়া শাকিব - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়,
মোঃ সিফাত হাসান, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,
কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ - শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
রওনক শাহরিয়ার - সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা,

প্রুফ রিড টিম

আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ - বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াসিমুল ইসলাম রাব্বি

রেফারেন্স

আমের ভিতরে পোঁকা হয় কীভাবে?

Fruit Flies - Mango (Drosophila) - Insect Science

This mango is bugged

Mango Fruit Fly | Pests & Diseases

Mango pulp weevil | Business Queensland.

Sternochetus mangiferae - Wikipedia

সোর্স:

Pneumonoultra Microscopicsilicovol Canoconiosis

হাই উঠলে আশেপাশের মানুষদের কেন হাই তোলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়?

Why are yawns contagious? We asked a scientist | PBS NewsHour

This is the Reason Why You Yawn When Other People Yawn

অ্যালার্জি বেড়ে গেলে সর্দি কাশি বেড়ে যায় কেন?

Reference:

*Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (10th e)

*Review of Medical Microbiology and Immunology (17th e)

ভ্যান্টাব্লাক কেন এত কালো?

www.surreynanosystems.com.

European Chemical Agency

Nano

NBCNews.com

Guinness World Records

British GQ

Applied Optics

Huffington Post

Dezeen

Car & Driver

The Verge

হিপনিক জার্ক কী?

১. "Hypnic Jerk." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 11 Apr. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Hypnic_jerk , Accessed 29 May 2023.

২. “হিপনিক জার্ক”, দৈনিক ইত্তেফাক, প্রকাশকাল ০১ জুলাই ২০২১, https://www.ittefaq.com.bd/256007/হিপনিক-জার্ক, সংগ্রহের তারিখ ২৯ মে ২০২৩

৩. “হিপনিক জার্ক কী আসলে ভয়ানক”, মো. ইমরান হাসান, কিশোর আলো, প্রকাশকাল ২০শে জুন ২০২২, https://www.kishoralo.com/হিপনিক-জার্ক-কি-আসলেই-ভয়ানক , সংগ্রহের তারিখ ২৯ মে ২০২৩

ব্রণ কেন হয়

https://www.aad.org/public/diseases/acne/causes/acne-causes

2. https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/acne/ss/slideshow-acne-dictionary
3. https://www.nhs.uk/conditions/acne/

মেরু অঞ্চলে বস্তুর ওজন বেশি কেন??

https://www.google.com/search?q=Why+is+the+weight+of+a+body+greater+at+the+poles+than+at+the+equator%3F&oq=Why+is+the+weight+of+a+body+greater+at+the+poles+than+at+the+equator%3F&aqs=chrome..69i57.198j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

টর্চলাইট এর আলো সর্বোচ্চ কত দূর যেতে পারে??

How far can light travel? | IOPSpark

Does Light Travel Forever? | Physics Van | UIUC (illinois.edu)

বিয়ন্ড দ্য মিথ: আনারস এবং দুধের কথিত প্রাণঘাতী জুটির পিছনে সত্যের সন্ধান

PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)
WebMD (www.webmd.com)
Mayo Clinic (www.mayoclinic.org)
National Institutes of Health (www.nih.gov)

এল-নিনো এবং লা-নিনা

http://www.jpl.nasa.gov/news/releases/97/elninoup.html
https://web.archive.org/web/20100127111633/http://www7.nationalacademies.org/opus/elnino.html
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensofaq.shtml#ENSO
https://web.archive.org/web/20090723123849/http://sealevel.jpl.nasa.gov/science/jason1-quick-look/
http://www.ericjlyman.com/elnino.html
http://www.oceanmotion.org/html/impact/el-nino.htm
https://web.archive.org/web/20120304095831/http://www.limaperunet.com/climate/climateall.html
http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/el-nino-story.html
http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/la-nina-story.html

Collatz Conjecture - গণিতের যে সমস্যার সমাধান হয়নি আজও

[1] The Simple Math Problem We Still Can't Solve, Quanta Magazine
[2] Collatz Conjecture, Wikipedia
[3] Bakuage Offers Prize of 120 Million JPY to Whoever Solves Collatz Conjecture Math Problem Unsolved for 84 Years, theweek.in (July 08, 2021)
[4] Collatz Problem, Wolfram MathWorld

Web 3

https://youtu.be/PyphVdVeP0A

রসায়নে নোবেল'২৩

1.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot

2.https://www.quora.com/Why-does-the-band-gap-of-nanoparticles-increase-with-a-decrease-in-size?ch=10&oid=48938059&share=c8ecad25&srid=uB58YP&target_type=question
3.https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/press-release/
4.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot
5.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Exciton
6.https://www.toppr.com/ask/en-bd/content/concept/energy-bands-in-solids-271350/
7.https://www.google.com/amp/s/www.geeksforgeeks.org/definition-and-classification-of-energy-bands/amp/
8.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Valence_and_conduction_bands&ved=2ahUKEwio2dH2gOKBAxVqxDgGHS9dA3wQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw3NuPqQ3IT4riTUVmjECv36
9.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Electronic_band_structure%23:~:text%3DIn%2520solid%252Dstate%2520physics%252C%2520the,band%2520gaps%2520or%2520forbidden%2520bands&ved=2ahUKEwiUk7fQgeKBAxVByzgGHep5AjsQFnoECA4QBQ&usg=AOvVaw0xqM4bWrOXQ0sHifu3nEfA

গণিতের ধাঁধা

ম্যাথ ম্যাজিক, কিশোর আলো, স্টারলিং পাবলিকেশন, নিউইয়র্ক।

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬০০০ কি.মি. হলে বিমান এবং স্যাটেলাইটে করে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে আলাদা আলাদাভাবে কত সময় লাগবে?

[১] Stratosphere - Wikipedia
[২] How rockets work: A complete guide | Space
[৩] Hypersonic Technology Vehicle 2 - Wikipedia
[৪] "Flight to Orbit," GRC, https://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/rocket/rktrflght.html
[৫] Orbital period - Wikipedia
[৬] Low Earth orbit - Wikipedia
[৭] International Space Station - Wikipedia
[৮] Earth Fact Sheet
[৯] "How Long Would It Take to Fly Around the World? | Executive Flyers," Executiveflyers, https://executiveflyers.com/how-long-would-it-take-to-fly-around-the-world
[১০] Vostok 5 - Wikipedia
[১১] Vostok 6 - Wikipedia
[১২] SpaceX Crew-5 - Wikipedia

রংধনু কেন বৃত্তাকার হয়?

1. Bohren, C.F, Huffman, D.R.(2006). Absorption and scattering of light by small particles.
2. Lynch, D.K., Livingston, W.C. (2001). Colour and light in nature. Cambridge University Press
3. Minnaert, M. (1993). The nature of light & colour in the open air. Dover Publications.

আমাদের শরীরের কোষের নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু কেন হয়? না হলে কী কী সমস্যা হতে পারে এবং কীভাবে আমরা এসব ক্ষতি ঠেকাতে পারি?

[১] Gilbert SF. Developmental Biology. 6th edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2000. The Cell Death Pathways.

[২] Elmore S. Apoptosis: a review of programmed cell death. Toxicol Pathol. 2007 Jun;35(4):495-516. doi: 10.1080/01926230701320337. PMID: 17562483; PMCID: PMC2117903.

[৩] Apoptosis. (n.d.). Genome.gov. Apoptosis

এলার্জি বাড়লে হাঁচি-কাশি বেড়ে যায় কেন?

*Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (10th e)

*Review of Medical Microbiology and Immunology (17th e)

গোল্ডিলক জোন কী?

"The Habitable Zone and the Search for Life" (Website: phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog/habitable-zone-and-the-search-for-life

"Exoplanet Archive" (Website: exoplanetarchive.ipac.caltech.edu)

"Kepler and K2 Missions" (Website: nasa.gov/mission_pages/kepler/main/index.html)

"The Goldilocks Zone"

Video: youtube.com/watch?v=2pfwY2TNehw

"Habitable Exoplanets Catalog" (Website: phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog)

ভূমিকম্পের সময় উঁচু ভবনের উপরে না কি নিচে বেশি কম্পন অনুভূত হয় এবং কেন?

Earthquake Behaviour of Buildings by C.V.R. Murty

https://www.iitk.ac.in/nicee/IITK-GSDMA/EBB_001_30May2013.pdf

Caltech seismological research

S.K Ghosh Associates LLC

কান্না করলে মন হালকা লাগে কেন?

www.health.harvard.edu

Book: Brain- A Journal to Neurology by A. De Watteville

ImageSource: Audacy